জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

জেলাঃ কক্সবাজার ।

পরিকল্পনা প্রণয়নে

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কক্সবাজার

সমন্বয়ে

বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহায়তায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

ক্রমাগত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়তই পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে আঘাত হানছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ,ফলে এদেশের মানুষ প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। কক্সবাজার বাংলাদেশের একটি উপকূলীয় জেলা হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পাহাড় ধ্বস, উপকূল ভাঙ্গন, আকস্মিক বন্যা, লবনাক্ততার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন জেলার অধিবাসীদের নিত্যসঙ্গী।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সমন্বিত প্রচেষ্ঠা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী-২"এর মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসুচীর আওতায় কক্সবাজার জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় বেসরকারী সংস্থা বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) কক্সবাজার জেলার একটি "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে। আশাকরি,এই সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগের প্রস্তুতি,জরুরী সাড়া প্রদান,দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ রুহুল আমিন
সভাপতি,
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ও
জেলা প্রশাসক
কক্সবাজার।

ককসবাজার জেলার "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলা হিল ডাউন সার্কিট হাউজের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত Validation Workshop এর কিছু খন্ড চিত্র

সূচীপত্র

ক্রমিকনং	বিষয়	পৃষ্ঠানং
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		
১.১	পটভূমি	৬
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৬
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৬
১.৩.১	জেলাভৌগলিক অবস্থান	৭
১.৩.২	আয়তন	৭-৮
১.৩.৩	জনসংখ্যা	৯
১.৪.	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ননা	
১.৪.১	অবকাঠামো	১০-১৩
১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১৩-২৪
১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	২৪-২৫
১.৪.৪	অন্যান্য	২৬-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ ও বিপদাপন্নতা		
২.১	দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৩১-৩৩
২.২	জেলা আপদ সমুহ	৩৪
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	৩৪-৩৫
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩৫
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৬৫-৪০
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৪০-৪৩
২.৭	সামাজিক মানচিত্র	৪৪
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৪৫-৪৬
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪৭
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪৮
২.১১	জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৪৮
২.১২	খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৪৮-৫০
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৫০-৫১
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস		
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫২-৫৫
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৫৫-৫৬
৩.৩	এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৫৭
৩.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৫৯
৩.৪.১	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৫৮

৩.৪.২	দুর্যোগ কালীন	৫৯
৩.৪.৩	দুর্যোগ পরবর্তী	৬০
৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৬১-৬৩
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান		
৪.১	জরুরী অপারেশনসেন্টার(EOC)	৬৪
৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৬৪
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৬৪
৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৬৫
৪.২.২	সতর্কবার্তা প্রচার	৬৫
২.৪.৩	জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৬৫
৪.২.৪	উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৬৬
৪.২.৫	আশ্রয় কেদ্র রক্ষাণাবেক্ষণ	৬৬
৪.২.৬	নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬৬
৪.২.৭	দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৬৬
৪.২.৮	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৬৬
৪.২.৯	শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৬৬
৪.২.১০	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৬৭
৪.২.১১	মহড়ার আয়োজন করা	৬৭
৪.২.১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৬৭
৪.২.১৩	আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৬৭
৪.৩	উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৬৭
৪.৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৬৭-৬৯
৪.৫	জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৬৯
৪.৬	অর্থায়ন	৭০
৪.৭	কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৭১
পঞ্চমঅধ্যায় ঃ উদ্ধার ও পুনবার্সন পরিকল্পনা		
৫.১	ক্ষয়ক্ষতিমূল্যায়ন	৭২
৫.২	দ্রুতপুনরুদ্ধারসংক্রান্তকমিটিগঠনঃ	৭৩-৭৪
	প্রশাসনিকপুনঃপ্রতিষ্ঠা / ধ্বংসাবশেষপরিষ্কার /জনসেবাপুনরারম্ভ/ জরুরী	
সংযুক্তি সমূহ		
সংযুক্তি ১	আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৭৫
সংযুক্তি ২	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৬-৭৭
সংযুক্তি ৩	উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৭৮-১১৪
সংযুক্তি ৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১১৫-১৩৫
সংযুক্তি ৫	এক নজরে জেলা/উপজেলা	১৩৬
সংযুক্তি ৬	বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	১৩৭
সংযুক্তি-৭	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেরতালিকা	১৩৮-১৫৯
সংযুক্তি-৮	নিরাপদ স্থান সমূহেরতালিকা	১৬০-১৮৩

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। ভূতাত্বিক গঠন ও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই দূর্যোগ প্রবন দেশ হিসাবে পরিগনিত। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এদেশের জন্য একটি পরিচিত দৃশ্যপট। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দূর্যোগ বড় অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দূর্যোগ সমুহের মধ্যে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, নদী-ভাঙ্গন, ভুমিধ্বস, ভুমিকম্প,টর্নেডো,কালবৈশাখী অন্যতম। প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পূর্নরুপে রোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভয নয়। দূর্যোগের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে,দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা,সঠিক কার্যকারিতা, সচেতনতা দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সার্বিকভাবে অনেকাংশে কমে যেতে পারে।এ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, জরুরি সাড়া সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে সরকার প্রনীত আইন ও স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর একটি সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে যা দূযোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা কোন না কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের দ্বারা কমবেশি আক্রান্ত হয়। তুলনামূলকভাবে উপকুলীয় জেলা সমুহ অনেক বেশী দূর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মধ্যে ককসবাজার অন্যতম। ককসবাজার জেলা মোট ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে অবস্থিত ৩টি দ্বীপ, পাহাড়, নদী,সমতল ভূমি সমেত এই জেলায় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, পাহাড়ী ঢলে আকস্মিক বন্যা, নদী ও খাল ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি অন্যতম প্রাকৃতিক দূর্যোগ। প্রতিবছর এই প্রাকৃতিক দূর্যোগ এতদ্বাঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এমতাবস্থায় দূর্যোগের সার্বিক ঝুকিহ্রাসের জন্য এই সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপন, নদী-খাল ভরাট, বন-পাহাড় ধ্বংস করণ, প্যারাবন কেটে ফেলাসহ বহুবিধ কর্মের ফলে সাম্প্রতিক কালে সারা দেশে ঘূর্ণিঝড় কালবৈশাখী, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, জোয়ারের পানিতে উপকুলীয় এলাকা প্লাবিত হওয়া, অতিবৃষ্টি, পাহাড় ধ্বস, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, তীব্র গরমসহ নানা প্রাকৃতিক আপদ/দুর্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কক্সবাজারের অধিকাংশ এলাকা নদী ও পাহাড় বেষ্টিত এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী হওয়ায় প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলে আঘাত হানে। ফলে এ জেলার অধিবাসীরা সামগ্রীকভাবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং অতি দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকেন। এই বিদ্যমান আপদ/দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুযোর্গকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করার লক্ষ্যে একটি **"জেলা সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"** প্রনয়ণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুকিহ্রাস করণে পরিবার, সমাজ, স্থনীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্বতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- জেলার জন্য দুর্যোগ সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ঠ কৌশল গত দলিল হিসাবে কাজ করবে।
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে (সরকারী, আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় এনজিও সংস্থা, দাতা) প্রতিটি পর্যায়ে এটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়নে ও বাস্তবায়নে র্নিদেশনা প্রদান করবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত

১.৩ ককসবাজার জেলার এলাকা পরিচিতিঃ

ককসবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি সীমান্তবর্তী জেলা। এই জেলার প্রাচীন নাম ছিল পালংকি, প্যানোয়া,আরকানিজ প্রভৃতি। শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্রমবির্বতনে এই জনপদ ইংরেজদের সাম্রাজ্যাধিনে চলে আসলে তৎকালিন বৃটিশ সরকার ১৭৯৯ সালে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে একজন সামরিক কর্মকর্তাকে এই অঞ্চলের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি বঙ্গোপসারের তীরে বাঁকখালী নদীর মোহনায় একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামের শেষাংশ "কক্স" এর সাথে মিলিয়ে এই বাজারের নাম রাখেন কক্স,এর বাজার বা কক্স সাহেবের বাজার। সময়ের আবর্তনে কক্স সাহেবের এই বাজারের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয়ে উঠে "ককসবাজার"।

কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের একাংশ ও মিয়ারমার । কক্সবাজার জেলার দর্শনীয় স্থান সমুহের মধ্যে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, বসুন্ধরা পার্ক, সোনাদিয়া, হিমছড়ি প্রাকৃতিক ঝর্না, আদিনাথ মন্দির, রামুর বৌদ্ধমন্দির, কুতুবদিয়ার বায়ু বিদ্যুৎ ও টেকনাফের মাথিনের কুপ ।

১.৩.১. ককবাজার জেলার ভৌগলিক অবস্থান :

দ্বীপ,নদী,পাহাড় ও সমতলভুমি নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে কক্সবাজার জেলার অবস্থান । কক্সবাজার দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে পার্বত্য জেলা বান্দরবান ও মিয়ানমার । কক্সবাজার জেলা ২০°৩৫ থেকে ২১°৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ।

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দিয়ে ককসবাজার জেলার একটি বৈচিত্র রয়েছে । জেলার কোথাও রয়েছে বিস্তীর্ন সমতল ভূমি,ফসলের মাঠ,আবার কোথাও পাহাড়-টিলা,নদ-নদী এবং সাগর । উচু পাহাড় ও বনভূমির মধ্যখানে সমতল ভূমি,নদীর তীরবর্তী এলাকা সমুহ কক্সবাজার জেলার কৃষি উৎপাদনকে সমৃদ্ধ করেছে । এ অঞ্চলের সমতল ভুমি বেলে, দোআঁশ, এঁটেলমাটি দিয়ে গঠিত । সমুদ্র তীরবর্তী উপকুলীয় অঞ্চলের ভুমি প্রাকৃতিক উপায়ে লবন উৎপাদন ও চিংড়ি চাষের জন্য বেশ উপযোগী ।
জেলা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, পাহাড়, সংরক্ষিত বনভূমি, সামুদ্রিক মৎস, নদী, খাল, জমি, গাছ-পালা, ঝাউবন ও প্যারাবন, মৎস্য সম্পদ,ইত্যাদি । মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, ধলঘাট-মাতারবাড়ী, শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্টর্মার্টিন ককসবাজার জেলার প্রধান দ্বীপ এবং মাতামুহুরী, বাঁকখালী, রেজু, কোহেলিয়া ও নাফ ককসবাজার জেলার প্রধান নদী । ককসবাজার জেলা চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ১০০ কিলোমিটর দক্ষিণে অবস্থিত ।

১.৩.২. আয়তন ঃ

কক্সবাজার জেলার মোট আয়তন ২,৪৯১.৮৬ বর্গকিলোমিটার । চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ককসবজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নিয়ে কক্সবাজার জেলা গঠিত । এই জেলায় মোট ৮টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা (ওয়ার্ড- ৩৯টি মহল্লা-১৬৪টি), ৭১টি ইউনিয়ন, ১৮৮টি মৌজা ও ৯৯২টি গ্রাম রয়েছে ।
ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

উপজেলার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম
১. চকরিয়া	১. খুটাখালী	০১. বাহলতলী, ০২. ফুলচরী, ০৩. জঙ্গল খুটাখালী, ০৪. মিটা খচ্ছপিয়া, ০৫. পুর্নগ্রাম
	২. ডুলহাজারা	০৬. বাঘাছড়ি, ০৭. ডুলহাজারা, ০৮. পাগলিরবিল, ০৯. রিংভং,
	৩. ফসিয়াখালী	১০. পানখালী, ১১.ফাসিয়াখালী, ১২. ঘুনিয়া, ১৩. হাজিয়ান, ১৪. রাজারবিল, ১৫. উচিতার বিল
	৪. বমু বিলছড়ি	১৬. বুম, ১৭. বিলছরি
	৫. সুরাজপুর মানিকপুর	১৮. মানিক পুর, ১৯. সুরাজপুর
	৬. কাকারা	২০. পাইথন, ২১. কাকারা, ২২. লতনী, ২৩. নলবিলা
	৭. লক্ষ্যারচর	২৪. লক্ষ্যারচর
	৮. চিরিংগা	২৫. চিরিংগা, ২৬. পালাকাটা
	৯. কৈয়ারবিল	২৭. ছোট ভেওলা, ২৮. কৈয়ারবিল, ২৯. কিলসড়ক ৩০. কোজাখালী
	১০. বরইতলী	৩১. বরই তলী, ৩২. পহরছাদা
	১১. হারবাং	৩৩. হারবাং (রিজার্ভ হারবাং)
	১২. শাহারবিল	৩৪. মাইজঘোনা, ৩৫. রামপুর, ৩৬. শাহার ঘোনা, পুর্ব বড় ভেওলা (আংশিক) পশ্চিম বড় ভেওলা(আংশিক)
	১৩. পূর্ব বড় ভেওলা	৩৭. পুর্ব বড় ভেওলা
	১৪. ভেওলা মানিকচর	৩৮. বেতুয়া, ৩৯. ভেওলা মানিকচর
	১৫. কোনাখালী	৪০. কোনাখালীর ঘোনা
	১৬. ডেমুশিয়া	৪১. ডেমুশিয়া
	১৭. পশ্চিম বড় ভেওলা	৪২. পশ্চিম বড় ভেওলা
	১৮. বদরখালী	৪৩. বদরখালী ঘোনা

উপজেলার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম
	১৯. চকরিয়া পৌরসভা	৪৪. বাটাখলী, ৪৫. ভরা মহুরী, ৪৬. খুজা নগর, ৪৭. বিনামারা, ৪৮. করইয়া ঘোনা, ৪৯. কাহারিয়া ঘোনা, ৫০. কুচপাড়া, ৫১. পুক পুকুরিয়া, ৫২. দিগর পানখালী, ৫৩. নিজ পান খালী, পালাকাটা (আংশিক)লক্ষ্যারচর (আংশিক) চিরিঙ্গা (আংশিক) কাকারা (আংশিক)
২. পেকুয়া	১. পেকুয়া সদর	**০১.** পেকুয়া, ০২. মেহেরনামা
	২. রাজাখালী	০৩. রাজাখালী
	৩. বারবাকিয়া	০৪. বারবাকিয়া
	৪. মগনামা	০৫. মগনামা
	৫. টইটং	০৬. টইটং, ০৭. বাতালী, ০৮. সোনাইছড়ি
	৬. উজানটিয়া	০৯. করইয়াদিয়া, ১০. উজানটিয়া
	৭. শিলখালী	১১. শিলখালী
৩. কুতুবদিয়া	১. **উত্তর ধূরং**	**০১.** উত্তর ধূরং মৌজা, ০২. চর ধূরং মৌজা
	২. দক্ষিণ ধূরং	০৩. দক্ষিণ ধূরং মৌজা
	৩. লেমশীখালী	০৪. লেমশী খালী মৌজা
	৪. কৈয়ারবিল	০৫. কৈয়ারবিল মৌজা
	৫. **বড়ঘোপ**	০৬. বড়ঘোপ মৌজা
	৬. আলী আকবর ডেইল	০৭. আলী আকবর ডেইল মৌজা, ০৮. রাজাখালী মৌজা, ০৯. খুদিয়ারটেক মৌজা
৪. মহেশখালী	১. মাতারবাড়ী	**০১.** মাতারবাড়ী মৌজা
	২. ধলঘাটা	০২. ধলঘাটা মৌজা
	৩. কালারমার ছড়া	০৩. কালারমারছড়া মৌজা, ০৪. কালিগঞ্জ মৌজা, ০৫. ঝাপুয়া মৌজা, ০৬. ইউনুছ খালী মৌজা, ০৭. উত্তর নলবিলা মৌজা
	৪. হোয়ানক	০৮. হোয়ানক মৌজা, ০৯. আমাবশ্যাখালী মৌজা, ১০. হরিয়ারছড়া মৌজা, ১১. হেতালিয়া মৌজা, ১২. পানিরছড়া মৌজা, ১৩. কেরুন তলী মৌজা
	৫. শাপলাপুর	১৪. দীনেশপুর মৌজা, ১৫. শাপলাপুর মৌজা, ১৬. মুকবেকী মৌজা, ১৭. নুনাছড়ি মৌজা, ১৮. ১২নং খাস মৌজা
	৬. বড় মহেশখালী	১৯. বড় মহেশখালী মৌজা, ২০. জাগিরা ঘোনা মৌজা, ২১. ফকিড়া ঘোনা মৌজা
	৭. ছোট মহেখালী	২২. ছোট মহেশখালী মৌজা, ২৩. পাহাড় ঠাকুরতলা মৌজা, ২৪. দক্ষিণ নলবিলা মৌজা, ২৫. সিপাহীর পাড়া মৌজা ১২ নং মৌজা (খাস)
	৮. কুতুবজোম	২৬. ঘটিভাঙ্গা মৌজা , ২৭. কুতুবজোম মৌজা
	৯. মহেশখালী পৌরসভা	২৮. গোরকঘাটামৌজা, ২৯. পুটিবিলা মৌজা, ৩০. হামিদারদিয়া মৌজা
৫. কক্সবাজার সদর	০১. ঝিলাংজা	**০১. ঝিলংজা, ০২. খরুলিয়া**
	০২. পাতলী মাছুয়া খালী	০৩. পাতলী মাছুয়াখালী, **০৪.** তুতক খালী
	০৩. খুরুশকুল	**০৫. খুরুশকুল , ৬.** তেতিয়া
	০৪. চৌপলদন্ডি	**০৭.** চৌপলদন্ডি
	০৫. ভারুয়াখালী	**০৮.** ভারুয়াখালী
	০৬. পোকখালী	**০৯. গোমাতলী, ১০. ইসাখালী,** ১১. পোকখালী
	০৭. ঈদগাঁও	১২. ভুমরিয়াঘোনা, ১৩.মাছুয়াখালী, জঙ্গল মাছুয়াখালী, ১৪. ঈদগাঁও (আংশিক)
	০৮. জালালবাদ	১৪. ঈদগাঁও (আংশিক)
	০৯. ইসলামাবাদ	১৫. বোয়ালখালী, ১৬. গজালিয়া, ১৭. সাতজুলাকাটা
	১০. ইসলামপুর	১৮. নাপিতখালী
	১১. কক্সবাজার পৌরসভা	১৯. ককসবাজার পৌরসভা
৬. রামু	০১. ঈদগড়	০১. জঙ্গল ঈদগড় মৌজা, ০২. ঈদগড় মৌজা ।
	০২. কাউয়ারখোপ	০৩. মনিরঝিল মৌজা, ০৪. সোনাইছড়ি মৌজা, ০৫. মইশকুম মৌজা, ০৬. কাউয়ারখোপ

উপজেলার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম	ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম
		মৌজা, ০৭. লর্ট উখিয়ারঘোনামৌজা, ০৮. উখিয়ারঘোনা মৌজা
	০৩. খুনিয়াপালং	০৯. পেঁচার দ্বীপ মৌজা, ১০. গোয়ালিয়াপালং মৌজা, ১১. ধোয়াপালং মৌজা, ১২. খুনিয়াপালং মৌজা, ১৩. ধেঁচুয়াপালং মৌজা, ১৪. দারিয়ারদিঘী মৌজা ।
	০৪. জোয়ারিয়ানালা	১৫. জোয়ারিয়ানালা মৌজা, ১৬. নোনাছড়ি মৌজা, ১৭. উত্তর মিঠাছড়ি মৌজা, ১৮. নন্দাখালী মৌজা
	০৫. কচ্ছপিয়া	১৯. কচ্ছপিয়া মৌজা, ২০. দক্ষিণ কচ্ছপিয়া মৌজা
	০৬. দক্ষিণ মিঠাছড়ি	২১. দঃমিঠাছড়ি মৌজা, ২২. চেইন্দা মৌজা, ২৩. উমখালী মৌজা
	০৭. গর্জনিয়া	২৪. গর্জনিয়া মৌজা, ২৫. জঙ্গল গর্জনিয়া মৌজা, ২৬. পশ্চিম গর্জনিয়া মৌজা ।
	০৮. রাজারকুল	২৭. রাজারকুল মৌজা
	০৯. চাকমারকুল	২৮. চাকমার কুল মৌজা
	১০. রশিদনগর	২৯. ধলির ছড়া মৌজা, ৩০. জঙ্গল ধলিরছড়া মৌজা, ৩১. উল্টাখালী মৌজা ।
	১১. ফতেখাঁরকুল	৩২. ফতেখাঁরকুল মৌজা, ৩৩. হাইটুপি মৌজা, ৩৪. মেরংলোয়া মৌজা, ৩৫. শ্রীকুল মৌজা ।
৭. উখিয়া	১. জালিয়াপালং	**০১.** জালিয়াপালং মৌজা, ০২. ইনানী মৌজা
	২. রত্নাপালং	০৩. রত্নাপালং মৌজা
	৩. হলদিয়া পালং	০৪. হলদিয়া পালং, ০৫. মরিচ্যা পালং মৌজা, ০৬. পাগলির বিল মৌজা, ০৭. রুমখা পালং মৌজা
	৪. রাজাপালং	০৮. উখিয়া মৌজা, ০৯. রাজাপালং মৌজা, ১০. ওয়ালাপালং মৌজা|
	৫. পালংখালী	১১. পালংখালী মৌজা, ১২. উখিয়া ঘাট মৌজা, ১৩. উখিয়ার ঘাট রিজার্ভ ফরেষ্ট মৌজা ।
৮. টেকনাফ	১. হোয়াইক্যং	**০১. মধ্য হ্নীলা, ০২. উত্তর হ্নীলা**
	২. হ্নীলা	০৩. দক্ষিন হ্নীলা
	৩. টেকনাফ সদর	**০৪.** লংগরবিল, **০৫. টেকনাফ-** টেকনাফ রির্জাভ ফরেষ্ট
	৪. সাবরাং	**৬. সাবরাং , ৭. শাহপরীর দ্বীপ**
	৫. বাহারছড়া	**০৮.** বড় ডেইল ও **০৯.** শীলখালী
	৬. সেন্টমার্টিন	**১০.** সেন্টমার্টিন
	৭. টেকনাফ পৌরসভা	১১. কুলাল পাড়া ও ১২. ইসলামবাদ

(তথ্যসূত্র উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয় পরিষদ)

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

কক্সবাজার জেলার মোট জনসংখ্যা ২৩,৮১,৮১৬ (তেইশ লক্ষ একাশি হাজার আটশত ষোল)। যার মধ্যে পুরুষ ১২,১৬,৬৪১ জন, মহিলা ১১,৬৫,৭৫জন, শিশু ৯,৭৪,১৩১জন, বৃদ্ধ-৪৬১৬০জন এবং প্রতিবন্ধি ৮,৯৩২ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক সংখ্যা বসবাস করে ৯১৯জন। এই জেলায় পরিবার সংখ্যা ৪,১৫,৯৫৪টি (চার লক্ষ পনর হাজার নয়শত চুয়ান্ন) এবং মোট ভোটার সংখ্যা ১২,০৩,৫২৮জন । উপজেলা ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা ও পরিবার'র সংখ্যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

উপজেলা	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার / খানা	ভোটার
চকরিয়া	২,৪৮,৮২৯	২,৪৪,৭২০	১,৯৬,০৫৩	৭,৩১০	৬,৯০৬	৪,৯৩,৫৪৯	৮৮,৩৯১	২,৫১,১৩৩
পেকুয়া	৮৯,৬২৯	৮৮,৫০৬	৭১,৯৩১	৪,৪৭৩	১,৬১৮	১,৭৮,১৩৫	৩১,৮৪৪	৯৩,৫১০
কুতুবদিয়া	৬৬,৫৬৪	৬৩,৫৪৪	৫০,৭৬৫	২,৭৬০	২,২৫৪	১,৩০,১০৮	২২,৫ ৮৭	৭৪,৬০৭
মহেশখালী	১,৭২,১৯৩	১,৬১,৬২৬	১,২০,৪৯৭	৫,৮৮৪	৪,৪০২	৩,৩৩,৮১৯	৫৮,১৭৭	১,৮৮,৫২৮
ককস সদর	২,৫২,২৬৮	২,২৬,৮৪৮	২,১০,৮৩৮	৫,৯৪৯	৫,২১৬	৪,৭৯,১১৬	৮২,৬৮৩	২,২২,৮৩৫
রামু	১,৪০,১৮৭	১,৩৬,৬৯৮	১,১০,৫২১	৪,৯৪৪	৩,৫১৪	২,৭৬,৮৮৫	৪৭,৯০৪	১,৩৯,৮০১
উখিয়া	১,০৮,৫৭৮	১,০৬,৭৫৫	৯২,৫৫৫	১০,১৬১	১,৯১২	২,১৫,৩৩৩	৩৭,৯৪০	১,০৬,৪৪৫
টেকনাফ	১,৩৮,৩৯৩	১,৩৬,৪৭৮	১,২০,৯৭১	৪,৬৭৯	২,৬৯৯	২,৭৪,৮৭১	৪৬,৩২৮	১,২৬,৬৬৯
মোট	১২,১৬,৬৪১	১১,৬৫,১৭৫	৯,৭৪,১৩১	৪৬,১৬০	২৮,৫২১	২৩,৮১,৮১৬	৪,১৫,৯৫৪	১২,০৩,৫২৮

(তথ্যসূত্র বিবিএস, প্রতিবন্ধির ক্ষেত্রে জেলা সমাজসেবার জরীপ)

১.৪ অবকাঠামো ও অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো ঃ

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ ঃ

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ৮টি মূল পোল্ডারে ২০টি শাখা পোল্ডারের অধীনে ৫৫৬.৫৫ কি.মি. বেঁড়ীবাঁধ আছে। জেলার এ বাঁধ সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা, দ্বীপ সমুহ, নদীর উপকুল, খালের তীর এলাকায় জোয়ারের পানি, জলোচ্ছাসসহ সমগ্র এলাকে রক্ষা করে থাকে। জেলায় সেচ কাজের জন্য ৭টি রাবার ড্যাম আছে।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ এই উপজেলার মোট বাধেঁর পরিমান **৪০.১২কি.মি.** । সমগ্র উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের চতুর্দিকে **১**টি বেড়িবাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি উপজেলাকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষার নিত্তিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ৭১নং পোল্ডার হিসাবে পরিচিত। বেড়ি বাধেঁর দৈর্ঘ্য ৪০.১২ কিলোমিটার যার প্রস্থ ১০ হতে ১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৭-১২ ফুট। আলী আকবর ডেইল হতে শুরু হয়ে বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং, লেমশীখালী হয়ে দ্বীপে চারদিকে পরিবেষ্টিত হয়ে আলী আকবর ডেইলে শেষ হয়।

পেকুয়া উপজেলাঃ উপজেলায় মোট ১২৮.৫২কি.মি. দীর্ঘ বেড়ীবাঁধ আছে। পেকুয়া উপজেলায় মগনামা, উজানটিয়া, রাজাখালী, বারবাকিয়া, শীলখালী ইউনিয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ৬৪/২এ এবং ৬৪/২বি নং পোল্ডার ১২৪.৫২ কিলোমিটার বেঁড়ীবাধ আছে যার প্রস্থ ৮ হতে ১২ ফুট এবং উচ্চতা ৬-১০ ফুট। মাতামহুরী সেচ প্রকল্পের অধীনে ৪কি.মি. আছে এবং ৮৪.৪০মিটার ১টি রাবার ড্যাম আছে।

চকরিয়া উপজেলা ঃ উপজেলায় ১৩৪.৭০কি.মি. বেড়ীবাঁধ আছে। বদরখালী, কোনাখালী, ডেমুশিয়া, ফসিয়াখালী , কাকারা, সুরাজপুর মানিকপুর, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা হারবাং এর ছড়া, শাহারবিল, পূর্ব বড় ভেওলা, ভেওলা মানিকচর, পশ্চিম বড় ভেওলা ইউনিয়ন ও চকরিয়া পৌরসভার মাতামহুরী নদী এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ৬৫, ৬৫/এ, ৬৫/এ-১, ৬৫/এ-৩, ৬৬/৪ পোল্ডার এবং পৌরসভা রক্ষা বাঁধ, হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্পসহ মোট ১৩৪.৭০ কিলোমিটার বেঁড়ীবাধ আছে যার প্রস্থ ৮ হতে ১২ ফুট এবং উচ্চতা ৫-১২ ফুট। এছড়া চকরিয়ার বাঘগুজারা ২৩৩.৫মিটার ও পালাকাটায় ১৮৬.৫মিটার ২টি রাবার ড্যাম আছে।

কক্সবাজার সদর উপজেলাঃ উপজেলায় ১০০.৯১কি.মি. বেড়ীবাঁধ আছে। উপজেলার খুরুশকুল, চৌপলদন্ডি, ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, ভারুয়াখালী, ঝিলংজা, পাতলী মাছুয়া খালী **ইউনিয়ন ও কক্সবাজার** পৌরসভা, বাঘখালী নদী এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ৬৬/১, ৬৬/২, ৬৬/৩ পোল্ডার এবং ককসবাজার শহর রক্ষা বাঁধসহ মোট ১০০.৯১ কিলোমিটার বেঁড়ীবাধ আছে যার প্রস্থ ৮ হতে ১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৬-১২ ফুট। এছাড়া বাঘখালী নদীতে ১টি, ঈদগাঁও লরাবাক খালের উপর ২টি রাবার ড্যাম আছে।

রামু উপজেলাঃ উপজেলায় বাকখালী নদী সংরক্ষণ এর জন্য ১৮কি.মি. বেড়ীবাঁধ আছে। এছড়ার উপজেলা সমগ্র ইউনিয়নে স্থানীয় সরকারের অধীনে নির্মিত ৪১টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ১৪০.৫ কিলোমিটার । ২টি রাবার ড্যাম আছে

টেকনাফ উপজেলাঃ উপজেলায় ৫৮.৬০কি.মি. বেড়ীবাঁধ আছে। সেন্টমার্টিন, হ্নীলা, সারবাং, টেকনাফ, বাহারছড়া ইউনিয়ন ও টেকনাফ পৌরসভা, নাফ নদী এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ৬৭, ৬৭/এ, ৬৭/বি, ৬৮ পোল্ডারে মোট ৫৮.৬০ কিলোমিটার বেঁড়ীবাধ আছে যার প্রস্থ ৮ হতে ১২ ফুট এবং উচ্চতা ৫-১২ ফুট।

স্লুইচ গেইট ঃ ২৫০টি

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত মোট ২৫০টি স্লুইচ / রেগুলেটর আছে। জেলার ৮টি উপজেলায় অবস্থিত এইসব স্লুইচ / রেগুলেটর খাল, বেঁড়ীবাঁধ ও নদীতে পানি নি:ষ্কাষন ও প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মান করা হয়েছে।। সমুদ্র উপকুলীয় এলাকার জোয়ারের পানি, নদী, খালের পানি গতি প্রবাহ ঠিক রাখার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। পেকুয়া উপজেলায় ৫২টি, চকরিয়া ৬১টি, কক্সবাজার সদর ৫৯, কুতুবদিয়া ১০, মহেশখালী ৩৬টি, উখিয়া ২টি এবং টেকনাফ উপজেলায় ৩০টি স্লুইচগেইট আছে। জেলার প্রায় স্লুইচগেইট কাজ করে তবে ১৫৫টি স্লুইচ গেইটের মেরামত করা প্রয়োজন।

ব্রীজ ঃ ৮৯৮টি

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় ৮৯৮টি ব্রীজ আছে। জেলার ৮টি উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন খাল-নদীর উপর, বিভিন্ন সড়কে, গ্রামীন রাস্তায় পানি প্রবাহ, মানুষের যাতায়ত ও গাড়ী চলাচলের জন্য, এলজিইডি, সওজ কর্তৃক এই সমস্ত ব্রীজ নির্মিত হয়। জেলার পেকুয়া উপজেলায় ৫৫ টি, চকরিয়ায় ১৪১টি, ককসবাজার সদরে ১১৭টি,রামুতে, ১৭৩টি, কুতুবদিয়ায় ৫৮টি, মহেশখালী উপজেলায় ১২০টি, উখিয়ায় ২১২টি এবং টেকনাফ উপজেলায় ২২টি ব্রীজ রয়েছে।

কালভার্ট ঃ ২,৭৬০টি

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় মোট ২,৭৬০টি কালভার্ট আছে। জেলার ৮টি উপজেলায় বিদ্যমান বিভিন্ন গ্রামীন রাস্তায় পানি চলাচল, স্থানীয় এলাকার অধীবাসীদের যাতায়তের জন্য এলজিইডি কর্তৃক এসব কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে। পেকুয়া উপজেলায় ২৫০টি, চকরিয়ায় ৪৩২টি, ককসবাজার সদরে ৪৪৯টি, কুতুবদিয়ায় ১৯৩, মহেশখালীতে ২৮২ টি, রামুতে ৩৭৬ টি, উখিয়ায় ৪১২টি এবং টেকনাফ উপজেলায় ৩৬৬টি কালভার্ট আছে।

ঘাট/জেটি ঃ ২৮টি

জেলায় মোট ২৮টি ঘাট রয়েছে। ঘাটগুলো জেলার অভ্যন্তরে নৌপথে যোগাযোগের জন্য ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহার হয়। কুতুবদিয়ায় উপজেলায় ৫টি ঘাট/জেটি রয়েছে। জেটিগুলো হলোঃ ১. আলী আকবর ঘাট জেটি, ২.বড়ঘোপ ঘাট জেটি, ৩. দরবার ঘাট জেটি, ৪. উত্তর ধূরং ঘাট জেটি ও ৫. আকবর বলি ঘাট জেটি (কাঠের জেটি), মহেশখালী উপজেলায় ৮টি ঘাট/জেটি রয়েছে। ১. গোরকঘাটা জেটি ঘাট, ২. আদিনাথ জেটি, ৩. শাপলাপুর ঘাট জেটি, ৪. শাকের মোহাম্মদ কাটা ঘাট ৪. জেমঘাট জেটি ও ৫. মাতারবাড়ী রাজাঘাট জেটি, ৬. ধলঘাটা শাপমারারডেইল, ৭. মুহরীঘোনা ঘাট ৮. বহানাকাটা ঘাট, টেকনাফ উপজেলায় ৫টি ঘাট/জেটি রয়েছে। ১. টেকনাফ বন্দর, ২. টেকনাফ বাজার ঘাট, ৩. সেন্টমার্টিন ঘাট জেটি, ৪. হ্নীলা ঘাট ৫. সাবরাং ঘাট, ককসবাজার সদর উপজেলায় ৩টি ঘাট/জেটি রয়েছে। ১. কস্তুরা ঘাট, ২। ৬নং জেটি ঘাট, ৩. চৌফলদন্ডি ঘাট, চকরিয়া উপজেলায় ৪টি ঘাট/জেটি রয়েছে। ১. বদরখালী জেটি ঘাট, ২। মালুমঘাট ঘাট, ৩.বদরখালী ৩নং ঘাট ৪. শাহারবিল ঘাট, **পেকুয়া উপজেলায়** ৩টি ঘাট/জেটি রয়েছে। ১. মগনামা ঘাট, ২। উজানটিয়া ঘাট, ৩. রাজাখালী ঘাট।

সড়ক/রাস্তা ঃ

ককসবাজার জেলায় চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার জনসাধারণের যাতায়তের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীন রাস্তাহ সর্বমাট ৪,৯৮৪.৭১ কিলোমিটার সড়ক,পাকা, এইচ বি বি ও কাচাঁরাস্তা রয়েছে। এই সমস্ত সড়ক ও রাস্তাসমুহ জেলার সাথে অন্য জেলা এবং জেলা সদরের সাথে বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন এবং এক উপজেলার সাথে অন্য উপজেলার সংযোগ স্থাপন করেছে। এছাড়া যথেষ্ট কাচাঁ রাস্তা, HBB রাস্তা যা এলাকার জনগণের মধ্যে চলাফেরার জন্য সহায়ক। নিম্নে জেলার মোট রাস্তার পরিমান প্রদান করা হলো ঃ

- ✓ মোট রাস্তার পরিমান ঃ ৪,৯৮৪.৭১ কিলোমিটার
- ✓ মোট পাকা রাস্তার পরিমান ঃ ৮৫৯.৮২ কিলোমিটার
- ✓ মোট কাঁচা রাস্তার পরিমান ঃ ৩,০৪৭.৩৪ কিলোমিটার
- ✓ মোট HBB রাস্তার পরিমান ঃ ৯২৬.৫৫ কিলোমিটার

উপজেলা ভিত্তিক সড়ক ও রাস্তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	ইউনিয়নের নাম	মোট (কিঃমিঃ)	পাকা (কিঃমিঃ)	কাঁচা (কিঃমিঃ)	HBB (কিঃমিঃ)
০১.	চকরিয়া	৯২৭.৮৫	২২১.১৫	৪৩২.৬৯	২০৪.০১
০২.	পেকুয়া	৪৪৮.১৯	৬১.৪১	২৮০.৪২	১০৬.৩৬
০৩.	কুতুবদিয়া	২৮০.০০	৭৪.০০	১২৪.০০	৮১.৫০
০৪.	মহেশখালী	৩১১.৭৬	৭১.৬৯	১৬৩.৪৭	৭৬.৬০
০৫.	ককসবজার সদর	১,০৮৪.১৩	১৭৯.৫০	৮২৯.০০	৭৫.৬৩
০৬.	রামু	৫৭৫.৯৮	৫০.৩৮	৪৪২.৪৯	৮৩.১১
০৭.	উখিয়া	৭৩৭.০০	৯৭.৫০	৪১৭.০০	২২৫.০০
০৮.	টেকনাফ	৬১৯.৮০	১০৪.১৯	৩৫৮.২৭	৭৪.৩৪
	মোটঃ	৪,৯৮৪.৭১	৮৫৯.৮২	৩,০৪৭.৩৪	৯২৬.৫৫

সেচ ব্যবস্থাঃ

ককসবাজর জেলা রবি ফসল উৎপাদনে সেচ্র জন্য নলকুপ,এলএলপি ও শ্যালোমেশিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহস্থলীর কাজ, ও পানীয় জলের জন্য অগভীর নলকুপ ব্যবহার করা হয়। গভীর নলকুপ গুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। জেলায় অগভীর নলকুপের সংখ্যা মোট ৬,১৬৭টি, গভীর নলকুপের সংখ্যা মোট ২,৫৭৮টি এবং এলএলপি'র সংখ্যা মোট ২,৭১৮টি। এই অগভীর নলকুপের গড় গভীরতা ৯০-১০০ ফুট এবং গভীর নলকুপের গড় গভীরতা ৫০০-৮০০ ফুট। ককসবাজার জেলায় সেচ কাজের জন্য ৭টি রাবার ড্যাম আছে। উপজেলা ভিত্তিক গভীর,অগভীর ও এলএলপি সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নে দেখানো হলো:

উপজেলার নাম	গভীর নলকুপ	অগভীর নলকুপ	LLP	মন্তব্য
চকরিয়া	৪২৫টি	১,৩৫০টি	১৩৭১টি	সেচ কাজের জন্য স্থানীয় কৃষকরা শীত মৌসুমে ছরায় অস্থায়ীভাবে মাটির বাঁধ দেয়। এছাড়া কিছু কিছু এলাকায় মটর চালিত অগভীর নলকুপ, বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত পাওয়ার পাম্প ব্যবহার করে সেচের পানির চাহিদা মিটায় এবং কৃষকরা জমি চাষে পাওয়ার ট্রিলার ব্যবহার করছে।
পেকুয়া	৮৫টি	৮৫টি	৪৫০টি	
কুতুবদিয়া	৩টি	৩৬৫টি	১৪৫টি	
মহেশখালী	২০৭টি	৯৪৫টি	৭টি	
ককসবজার সদর	১১১টি	১,০২৫টি	২৫৫টি	
রামু	৩৫২টি	৭৪০টি	২৫৭টি	
উখিয়া	১,৩৯৫টি	১,৬৩১টি	১৮৬টি	
টেকনাফ	-	২৬টি	৪৭টি	
মোট	২,৫৭৮টি	৬,১৬৭টি	২,৭১৮টি	

হাট বাজারঃ

ককসবাজার জেলায় মোট ১৭৫টি হাট ও বাজার রয়েছে যা উপজেলা ভিত্তিক নিচে প্রদান করা হলোঃ

চকরিয়া উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ৩৯টি হাট ও বাজার রয়েছে। দক্ষিণ মানিকপুর বাজার, উত্তর মানিকপুর বাজার, মাঝেরপাড়ি, কাকারা বটতলী, শাহ উমরাবাদ, শিকলঘাট, চিরিংগাবাজার, ঘর্সাহাট বাজার, মগবাজার, বাটাখালীবাজার, মাইজঘোনাবাজার, রামপুর বাজার, চৌয়ারপাড়িবাজার, শাহারবিল ষ্টেশনবাজার, বেতুয়াবাজার, উত্তর বহদ্দারহাট বাজার, দক্ষিন বহদ্দারহাট বাজার, বাংলাবাজার, ইলিশিয়াবাজার, দরবেশকাটা বাজার, জমিদারপাড়া বাজার, বদরখালী বাজার, মালুমঘাটবাজার, ডুলহাজারা বাজার, খুটাখালীবাজার, মাছঘাটা বাজার, ভেন্ডিবাজার, গাবতলী বাজার, ফকিরহাটখোলা, একতা বাজার, শান্তি বাজার, ফুলছড়ি বাজার, দান্ডিবাজার, বানিয়ারছড়া বাজার, হারবাং ষ্টেশন বাজার, হারবাং মগবাজার, হারবাং বাজার, বাংলাবাজার, কৈয়ারবিল বাজার।

পেকুয়া উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ১৬টি হাট-বাজার রয়েছে। চড়াপাড়াবাজার, সোনালীবাজার, রূপালীবাজার, সৈকতবাজার, মৌলভীবাজার, সবুজবাজার, হাজীরবাজার, পেকুয়াবাজার, বাগগুজারাবাজার, কাজীরবাজার, আমিন বাজার, টইটংবাজার, বারবাকিয়াবাজার, আরবশাহ বাজার, মগনামা ফুলতলাবাজার, শীলখালী জনতাবাজার।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ৯টি হাট-বাজার রযেছে। উত্তর ধুরং ঘাট বাজার, আকবরবলীর ঘাট, ধুরং বাজার শনিবার ও মঙ্গলবারে হাট বসে, দরবার হাট, দরবার ঘাট বাজার, চৌমুহনীবাজার, বড়ঘোপ বাজার শুক্রবার ও সোমবারে হাট বসে, বিদ্যুৎ মার্কেট, শান্তিবাজার, তাবলেরচরবাজার, ঘাট ঘরবাজার, নাছিয়ারপাড়া বাজার।

মহেশখালী উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ৪৬টি হাট-বাজার রযেছে । খন্দকার পাড়া বাজার, কবির বাজার, বটতলী বাজার, কালা মিয়া বাজার, তাজিয়া কাটা বাজার, ঘটি ভাঙ্গা বাজার, বুজরুক্যরবর বাজার, বড় মহেশখালী নতুন বাজার, রাস্তার মাথা বাজার, লুয়াইন্না বাজার, সিপাহীর পাড়া বাজার, লম্বাঘোনা বাজার, ঠাকুর তলা বাজার, মহুরী ঘোনা বাজার, সুতরিয়া বাজার, কালাগাজী পাড়া বাজার, মহুরা কাট বাজার, বড়ছড়া বাজার, পানির ছড়া বাজার মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট বসে, কালালিয়া কাটা বাজার রবিবার ও বুধবার হাট বসে, কেরুনতলী বাজার, হোয়ানক টাইম বাজার, ছনখোলা বাজার, টাইমবাজার। উত্তর ঝাপুয়া বাজর, দ: ঝাপুয়া বাজার, ইউনুছখালী বাজার, বড়ুয়া পাড়া বাজার, আধার ঘোনা বাজার, মিজ্জির পাড়া বাজার, নয়াপড়া পান বাজার শনি বার ও মঙ্গলবার হাট বসে, নুনাছড়ি রবিবার ও বুধবার হাট বসে, চালিয়া তলী মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট বসে, কালরমারছড়া সোমাবর ও বৃহস্পতি বার হাট বসে, মাতারবাড়ীতে নতুন বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, ফকিরা বাজার রবিবার ও বুধবার হাট বসে, মগডেইল বাজারসোমবার ও বৃহস্পতি বার হাট বসে, শান্তি বাজার, বাংলা বাজার, উত্তর রাজঘাট বাজার, দক্ষিন রাজঘাট বাজার, সিকদারপাড়া বাজার, শাপলাপুর বাজার, কায়দাবাদ বাজার, জে এম ঘাট বাজার, গোরকঘাটা বড় বাজার ও বানিয়ার দোকান বাজার।

ককসবজার সদর ঃ এই উপজেলায় মোট ১৫টি হাট-বাজার রযেছে। ঈদগাঁওবাজার শনিবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, কালিরছড়া বাজার, ইসলামপুর বাজার, বাংলা বাজার বুধ ও রবিবার, খরুলিয়া বাজার রবি ও বৃহ:বার, পোকখালী মুসলিম বাজার, নুর মোহাম্মদ চৌধুরী বাজার, চৌফলদন্ডি বাজার, খুরুশকুল নতুন বাজার, টাইম বাজার শুক্রবার ও সোমবার হাট বসে, ভারুয়াখালী বাজার, উপজেলা পরিষদ বাজার শুক্রবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, লিংকরোড বাজার শুক্রবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, জুমছড়িবাজার, ইসলামপুর নতুন অফিস বাজার।

রামু উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ২৫টি হাট-বাজার রযেছে। **ঈদগড় বাজার,** শুক্রবার ও সোমবার হাট বসে, **কাউয়ারখোপ বাজার** সোমবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, **পশ্চিম ঢেচুয়াপালং বাজার** রবিবার ও বুধবার হাট বসে, **চা বাগান ও জোয়ারিয়ানালা বাজার** সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে, **মৌলভী বাজার,** রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে, কচ্ছপিয়া ইউনিয়নে**গর্জনিয়া** বাজার সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে, **কাডির মাথা বাজার** শুক্রবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, পানেরছড়া, উমখালী ও ছিদ্দিকের বাজার, থিমছড়ি বাজার শুক্রবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, বেলতলী টাইম বাজার ও নয়া বাজার, শিকলঘাট, পঞ্চেখানাও পাল পাড়া বাজার, **কলঘর বাজার** শুক্রবার ও সোমবার হাট বসে, **কলঘর বাজার, পানিরছড়া মামুন মিয়ার বাজার, নতুন বাজার** বুধবার ও শনিবার,

রবিবার হাট বসে, জেটির রাস্তার বাজার, মাছোয়াখালী বাজার, **উল্টাখালী বাজার, ফকিরা বাজার তেমুহনি** শনিবার ও মঙ্গলবার হাট বসে, **শিকলঘাট মধ্যম মেরংলোয়া** বাজার ।

উখিয়া উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ১২টি হাট-বাজার রয়েছে । সোনারপাড়া বাজার রবিবার ও বুধবার হাটবসে, চারাবটতলী বাজার, বটতলী বাজার, কোর্ট বাজার, ভালুকিয়া বাজার, মরিচ্যা বাজার রবিবার ও বুধবার হাটবসে, পাতাবাড়ি বাজার সোমবার ও বৃহস্পতিবার, রুমখা বাজার, কুতুপালং বাজার, উখিয়া দারগা বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার হাটবসে, পালংখালী বাজার শুক্রবার সাপ্তহিক হাট বসে, বালুখালী বাজার,

টেকনাফ উপজেলাঃ এই উপজেলায় মোট ১৩টি হাট-বাজার রয়েছে । শাহপরীরদ্বীপ বাজার, নয়াপাড়া বাজার, সিকদারপাড়া বাজার, লেংগুরবিল বাজার, মিটা পানিরছড়া বাজার, হ্নীলা বাজার, মৌলভীপাড়া বাজার, মিনা বাজার, খাবাংখালী বাজার, হেয়াইক্ষন বাজার, শামলাপুরবাজার, বড়ডেইল বাজার, মাথাভাঙ্গাবাজার ।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

জেলার সামাজিক সম্পদ বর্ণনায় এলাকার ঘরবাড়ী, পানির উৎস, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং যেগুলো দুযোর্গ প্রস্তুতি ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে । ককসবাজার সমুদ্রতীরবর্তী জেলা হিসাবে এই অঞ্চলের সামাজিক সম্পদে'র নানাবিদ ঝুঁকি/আপদ রয়েছে । এখানে দরিদ্র মানুষদের আবাসনের যেমন সমস্যা, তেমনি নিত্য প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সংকটও কম নয় । সেইসাথে পয়নিঃস্কাশনের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ নানা রোগ-শোকে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

ককসবাজার জেলার সামাজিক সম্পদের সার্বিক চিত্র নিচে সন্নিবেশিত করা হলো:

- ✓ মোট ঘরবাড়ীর সংখ্যা : ৪,১৫,৯৫৪টি
- কাঁচা (মাটি দিয়ে তৈরী) ঘরবাড়ীর সংখ্যা : ২,০৭,৯৭৯টি
- টিনের তৈরী ঘরবাড়ির সংখ্যা : ১,৪৫,৫৫৯টি,
- আধাপাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা : ৪১,৫৯৯টি এবং
- পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা : ২০,৭৯৭টি ।

ঘরবাড়ি ঃ

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় মোট ৪,১৫,৯৫৪টি ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ৫০% ঘরবাড়ি কাচাঁ, ৩৬% ঘর টিনের তৈরী, ১০% ঘরবাড়ি আধাপাকা এবং ৫% বাড়ি পাকা দালান । নিম্নে উপজেলা ভিত্তিক ঘরবাড়ীর তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	উপজেলার নাম	ঘরের সংখ্যা	কাঁচা ঘর	টিনের তৈরী ঘর	আধাপাকা	পাকা দালান
০১.	চকরিয়া	৮৮,৩৯১	৫৫%	৩৫%	৬%	৪%
০২.	পেকুয়া	৩১,৮৪৪	৫৭%	৩৮%	৩%	২%
০৩.	কুতুবদিয়া	২২,৫৮৭	**৫২%**	**৩৮%**	**৭ %**	**৩ %**
০৪.	মহেশখালী	৫৮,১৭৭	৪০%	৪১%	১৫%	৪%
০৫.	ককসবজার সদর	৮২,৬৮৩	৩৩%	৩০%	২২%	১৫%
০৬.	রামু	৪৭,৯০৪	**৫৬%**	**৩৫%**	**৮%**	**৪%**
০৭.	উখিয়া	৩৭,৯৪০	**৫৫%**	**৩৪%**	**৯%**	**২%**
০৮.	টেকনাফ	৪৬,৩২৮	**৫১%**	**৩৮%**	**৮%**	**৩%**
	মোট	**৪,১৫,৯৫৪**	**৫০%**	**৩৫%**	**১০%**	**৫%**

চকরিয়া উপজেলা ঃ মোট ৮৮,৩৯১টি ঘরের মধ্যে ৪৮,৬১৫টি ঘর কাঁচা, ৩০৯৩৭ টি ঘর টিনের তৈরী, ৫,৩০৪টি ঘর আধাপাকা এবং ৩,৫৩৫টি ঘরপাকা ।

পেকুয়া উপজেলাঃ মোট ৩১,৮৪৪টি ঘরের মধ্যে ১৮,১৫১টি ঘরকাঁচা, ৯৫৫টি ঘর টিনের তৈরী, ১১৬৫টি ঘরর আধাপাকা এবং ৬৩৬ টি ঘর পাকা ।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ মোট ২২,৫৮৭টি ঘরের মধ্যে ১১৭৪৫টি ঘরকাঁচা, ৮,৫৮৩টি ঘর টিনের তৈরী, ১৫৮১টি ঘর আধাপাকা এবং ৬৭৭টি ঘর পাকা ।

মহেশখালী উপজেলাঃ মোট ৫৮,১৭৭টি ঘরের মধ্যে ২৩,২৭০ টি ঘর কাঁচা, ২৩,৮৫২ টি ঘর টিনের তৈরী, ৭,৮২৬টি ঘর আধাপাকা এবং ২০৮৭টি ঘর পাকা ।

কক্সবাজার উপজেলা ঃ মোট ৮২,৬৮৩টি ঘরের মধ্যে ২৭,২৮৫টি ঘরকাঁচা, ২৪,৮০৫টি ঘর টিনের তৈরী, ১৮,১৯১টি ঘর আধাপাকা এবং ১২,৪০২ টি ।

রামু উপজেলা ঃ মোট ৪৭,৯০৪টি ঘরের মধ্যে ২৬,৮২৬টি ঘর কাঁচা, ১৭,১১৬ টি ঘর টিনের তৈরী, ৩,৮৩২টি ঘর আধাপাকা এবং ১৯১৬ টি ঘরপাকা।

উখিয়া উপজেলা ঃ মোট প্রায় ৩৭,৯৪০টি ঘরের মধ্যে ২০,৮৬৭টি ঘরকাঁচা, ১২,৮৯৯টি ঘর টিনের তৈরী, ৩,৪১৪টি ঘর আধাপাকা এবং ৭৬০ টি ঘরপাকা।

টেকনাফ উপজেলা ঃ মোট ৪৬,৩২৮টি ঘরের মধ্যে ২৩,৬২৭টি ঘর কাঁচা, ১৭,৬০৪ টিনেরঘর টিনের তৈরী, ৩,৭০৬টি ঘর আধাপাকা এবং ১৩৯১টি ঘরপাকা।

পানি ঃ

কক্সবাজার জেলার খাবার পানি ও গৃহস্থালীর প্রধান উৎস হলো পুকুর, নলকুপ,পাহাড়ী ঝর্ণা ও ছরা। জেলার প্রায় ৯০% লোক পুকুর ও নলকুপের পানি ব্যবহার করে থাকে। বেশীর ভাগ জনগন নলকুপের পানি ব্যবহার করে থাকে। জেলার মোট নলকুপের সংখ্যা ২১,৮৩৪ টি। জেলায় গভীর ও অ-গভীর দুই ধরনের নলকুপ রয়েছে। মোট অগভীর নলকুপের সংখ্যা ১৩,৩৫৭ টি এবং গভীর নলকুপের সংখ্যা ৮,৪৭৭ টি। এর মধ্যে ২০,৮৩৪টি নলকুপ ভাল এবং প্রায় ১,০০০টি নলকুপ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট নলকুপের সংখ্যা	নলকুপের অবস্থা		
			ভাল	নষ্ট	গভীর/অগভীর
০১.	চকরিয়া	৪,৫৯৮টি	৪,৪১৮টি	১৮০টি	**গভীর-১৭৬২টি / অগভীর-২৮৩৬টি**
০২.	পেকুয়া	১,৫৪৩টি	১,৪৭৯টি	৬৪টি	**গভীর-১২৩৮টি / অগভীর-৩০৫টি**
০৩.	কুতুবদিয়া	**১,৭৪৫ টি**	**১,৬২১ টি**	**১২৪ টি**	**গভীর-৯৭৩ / অগভীর-৭৭২**
০৪.	মহেশখালী	২,৯৯৩টি	২,৯২০টি	৭৩টি	**গভীর-১০৭১টি / অগভীর-১৯২২টি**
০৫.	ককসবজার সদর	৩,৪৭৫টি	৩,৩১০টি	১৬৫টি	**গভীর-১৬৭০টি / অগভীর-১৮০৫টি**
০৬.	**রামু**	**২,৮০৪টি**	**২,৭০১টি**	**১০৩টি**	**গভীর-৬২১টি / অগভীর-২১৮৩টি**
০৭.	উখিয়া	**২,৫৪০টি**	**২,৪৬২টি**	**৭৮ টি**	**গভীর- ৮১১/ অগভীর- ১৭২৯ টি**
০৮.	টেকনাফ	**২,১৩৬টি**	**১,৯২৩টি**	**২১৩টি**	**গভীর-৪১২টি / অগভীর-১৮০৫টি**
	মোট	**২১,৮৩৪টি**	**২০,৮৩৪টি**	**১,০০০টি**	

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ঃ

কক্সবাজার জেলায় মোট স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা ২,১৯,৩৭৪টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানার হলো ৬৪,২৪৭টি, কাঁচা পায়খানার হলো ১,৫৫,১২৭টি, জেলায় অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা আছে ৬০,১৭২টি। কাঁচাপায়খানার ক্ষেত্রে সাইফেন নষ্ট হয়ে অস্বাস্থ্যকর পায়খানায় পরিনত হচ্ছে। বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপিত পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৬৪,২৪৭টি এবং বন্যার সময় ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে প্রায় ১,৫৫,১২৭টি পায়খানা। ককসবাজার জেলায় ৭৮.৩৫৫% লোক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। উল্লেখ্য থাকে যে কাচা পায়খানা গুলো বন্যা এবং ঘূনিঝড়ের সময় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নিম্নে উপজেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা, প্রকার, এবং ব্যবহারের হার প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কয়টি	জলাবদ্ধ পায়খান (কাঁচা)	জলাবদ্ধ পায়খান (পাকা)	খোলা পায়খানা	পায়খানা ব্যবহার %
০১.	চকরিয়া	৪১,৭৭১টি	২৮,৮২২ টি	১২,৯৪৯ টি	৯,৭৯৮	৮১.২৩%
০২.	পেকুয়া	২৩,৮৯৮টি	১৬,৭২৯ টি	৭,১৬৯ টি	২,৮৫১	৮৯.৩৪%
০৩.	কুতুবদিয়া	১৭,৩৮১টি	১২,৩৮৪ টি	৪,৯৯৭ টি	৫,৮৩৬	৭৪.০০ %
০৪.	মহেশখালী	২৮,২৪৯টি	২০,৪৭০ টি	৭,৭৭৯টি	১১,৬৯০	**৭০.৭৩%**
০৫.	ককসবজার সদর	৩১,৭০৮টি	১৯,২৯৪ টি	১২,৪১৪টি	৯,৬৭০	**৭৬.৬৩%**
০৬.	রামু	২৬,১২৩টি	১৮,০২৫ টি	৮,০৯৮ টি	৫,৫৬৭	৭৯.৯১%
০৭.	উখিয়া	২৭,৯৫৫টি	২৩,৫৭৭টি	৪,৩৭৮ টি	৯,৯৮০	৭২.৬০%
০৮.	টেকনাফ	২২,২৮৯টি	১৫,৮২৬ টি	৬,৪৬৩ টি	৪,৭৮০	৮২.৩৪%
	মোট	২,১৯,৩৭৪	১,৫৫,১২৭টি	৬৪,২৪৭ টি	৬০,১৭২	৭৮.৩৫%

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৬১৫টি

- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ২০১টি
- কেজি স্কুল ঃ ১৫৬টি
- কলেজ ঃ ২৬টি
- মাদ্রাসা ঃ ১৩৫টি
- বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১টি
- মেডিকেল কলেজ ঃ ১টি

- রামু উপজেলায় ৫৯টি সরকারী ও ৪৫টি বেসরকারী প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয় ,মাদ্রাসা ও কলেজ রয়েছে। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলেতে মোট ৮৫৭জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছেন এবং এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৫০,২২৭জন।
- প্রাথমিক,নিম্ন মাধ্যমিক ,উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়,ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও কলেজ মিলে কুতুবদিয়া উপজেলায় মোট ৫৭টি সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৫৭৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে এবং এখানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯,০৯৭ জন।
- মহেশখালী উপজেলায় ৭০ টি সরকারী ও ৬৪ টি বেসরকারী প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক,উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদ্রাসা ইবতেদায়ী ও কলেজ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে মোট ১২৫২ ৭জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছেন এবং সবকটি প্রতিষ্ঠান মিলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪,৬৭২ জন।
- চকরিয়া উপজেলায় ১৩৮টি সরকারী ও ৮৬টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। প্রাথমিক,নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়,ইবতেদায়ী, মাদ্রাসা ও কলেজ বিদ্যমান। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৬৩৫জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০,৪৭৮ জন।
- পেকুয়া উপজেলায় ইবদেয়ী,প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ,উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদ্রাসা ও কলেজ মিলে মোট ৪৭টি সরকারী ও ১৯টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। । এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ২৮৭ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন এবং এখানে অধ্যায়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১,২৬৪ জন।
- এবতাদেয়া, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ মিলে উখিয়া উপজেলায় ৭৬টি সরকারী ও ৪৩টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৮৭৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০,৮৮২ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত রয়েছে।
- কক্সবাজার সদর উপজেলার ১০৫ টি সরকারী ও ৭৮টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। এরমধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয়,বিশ্ববিদ্যালয়,মাদ্রাসা,ইবতেদায়ী ও মেডিকেল কলেজ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৪৬৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১,৪২৫ জন। তবে বে-সরকারী ৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় সংযুক্ত করা হয়নি। **জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা এতদ্বসংগে সংযুক্ত করা হলো। সংযুক্তি "৭"**

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

কক্সবাজার জেলায় মোট ৩,৭৫৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে ৩,৩৩১টি মসজিদ, ৩০০টি হিন্দুমন্দির, ৬টি গীর্জা ও ১১৬টি বৌদ্ধ ক্যাং।

ক্রমিক নং	উপজেলায়	কয়টি/বর্ননা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
০১.	চকরিয়া	মসজিদ-৬৭০টি, মন্দির-৫৭টি, গীর্জা - ৫টি, ক্যাং - ২০টি	প্রত্যেক ধর্মের লোকজন তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করে থাকে। প্রায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উচু জায়গায় নির্মিত।
০২.	পেকুয়া	মসজিদ- ৩১৬ টি, মন্দির- ১০টি, ক্যাং- ৩ টি	
০৩.	কুতুবদিয়া	মসজিদ- ২০২টি, মন্দির-৪০টি	
০৪.	মহেশখালী	মসজিদ- ৩৮৩টি, মন্দির- ২৯টি, ক্যাং- ৮ টি	
০৫.	ককসবজার সদর	মসজিদ- ৫১১টি, মন্দির ৮৯টি, ক্যাং- ১৭টি, গীর্জা ১টি	
০৬.	রামু	মসজিদ-৪৩৯টি, মন্দির- ৪৬টি, ক্যাং- ১৭ টি	
০৭.	উখিয়া	মসজিদ - ৩৩৮টি, মন্দির- ২০টি, ক্যাং -৩৫ টি	
০৮.	টেকনাফ	মসজিদ- ৪৫৬টি, মন্দির- ৯টি,ক্যাং - ১৬টি	

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) :

কক্সবাজার জেলায় ছোটবড় মোট ৬৬টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) রয়েছে। এই গুলোতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈদের নামাজ, জানাজার নামাজ আদায় সহ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করে থাকেন। এছাড়া জেলার ৩,৭৫৩টি মসজিদে ঈদের নামাজের জন্য ধর্মীয় জমায়েত হয়ে থাকে।

কক্সবাজার উপজেলাঃ সদর উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) ১২টি । এগুলো হলো হাশেমিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মাঠ, পৌরসভার ঈদগাঁহ ময়দান, দক্ষিন বাহারছড়া মাঠ, ঈদগাঁহ ইউনিয়নে ২টি, চৌফলদন্ডি ইউনিয়নে ১টি, ইসলামপুরে ১টি, ঝিলংজায় ১টি, ইসলামাবাদ ইউনিয়নে ১টি, পাতলী মাছুয়া খালী ১টি, পোকখালী ১টি জালালবাদ ইউনিয়নে ১টি । এগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।

রামু উপজেলা ঃ ধর্মীয় জমায়েত স্থান **(ঈদগাঁহ) ১১টি** । খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ১, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে ৩টি, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের ১, ২, ৭, ৪ ও ৬নং ওয়ার্ড ৫টি, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড ২টি, ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নে ১টি । উঁচু জায়গায় হওয়ায় সাধারণত পানি উঠেনা ।

উখিয়া উপজেলা ঃ উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) ৬টি । রাজাপালং ইউনিয়নে ২টি, রত্নাপালং ইউনিয়নে ১টি, হলদিয়াপালং ইউনিয়নে ১টি, জালিয়াপালং ১টি, পালংখালী ইউনিয়নে ১টি ।

টেকনাফ উপজেলা ঃ টেকনাফ উপজেলায় **৫টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) রয়েছে । টেকনাফ পৌরসভায় ১টি, হ্নীলায় ১টি, সারবাং ২টি, শাহপরীরদ্বীপ ১টি, বাহারছড়া ১টি, হোয়াইকং ১টি** । বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরে পানি দ্রুত নেমে যায় ।

চকরিয়া উপজেলাঃ চকরিয়া উপজেলায় **১৬টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) রয়েছে । চকরিয়া সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাট, মগবাজার মাঠ, বদরখালী, দরবেশকাটা, খুটাখালী, ডুলহাজারা, কৈয়ারবিল, ইলিশিয়া, শাহারবিল মাদ্রসা, কোনাখালী, কাকারা, মানিকপুর, ফাসিয়াখালী, সুরজপুর, বরইতলী, ভেওলা মানিকচর ১টি করে,** ।

মহেশখালী উপজেলাঃ উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) ৬টি । বড়মহেশখালী ইউনিয়নে ২ টি বড় ডেইলে ও মুন্সির ডেইলে, কালারমারছড়া ইউনিয়নে ২টি ঝাপুয়া, সোনারপাড়া, শাপলাপুর ১টি, হোয়ানক ১টি । স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।

পেকুয়া উপজেলাঃ পেকুয়া উপজেলায় ৬টি **ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) রয়েছে । এগুলো পেকুয়া, বারবাকিয়া, শীলখালী, রাজাখালী, টেইটং, মেহেরনামা ইউনিয়নে অবস্থিত** ।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ কুতুবদিয়া উপজেলায় ৪ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) রয়েছে । উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডে ছামদিয় আলিম মাদ্রাসা **প্রাঙ্গন,** দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড **ধূরং উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ,** বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড **কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ,** আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৫ ওয়ার্ড মশরফ আলী সিকদারপাড়া প্রাঙ্গন ও সন্দীপিপাড়া ইফাদ কিল্লা মাঠ । জোয়ারের পানি বৃদ্বি পেলে বা জলোচ্ছাস হলে পানি উঠে । স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।

স্বাস্থ্য সেবাঃ

ককসবাজার জেলায় সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা মোট ২৮৩টি । এর মধ্যে সরকারী ২৬১টি ও বেসরকারী ২২টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র আছে । সরকারীভাবে জেলায় ১টি জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ, ১টি মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র, ১টি টিবি হাসপাতাল, ৮টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সেন্টমার্টিনে ১টি ১০শর্য্য হাসপাতাল, ১৩টি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬৩ টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ১৭৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে ।

জেলা সদরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ একটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে । তাছাড়া জেলা মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র, টিবি হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল জেলা সদরে অবস্থিত । দ্বীপ ইউনিয়ন সেন্টমার্টিনে ১০শয্যা, উপজেলা পর্যায়ে চকরিয়া ৫০শয্যা, পেকুয়া ৩১শয্যা , কুতুবদিয়া ৫০শয্যা, মহেশখালী ৫০শয্যা, ককসবজার ২৫০শয্যা, রামু ৩১শয্যা, উখিয়া ৫০শয্যা, টকনাফ ৫০শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল । এই হাসপাতালসমুহে বর্তমানে ৭২জন ডাক্তার ও ৯৭ জন নার্স কর্মরত আছেন ।

৮টি উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে । এগুলো হলো : চকরিয়া ২টি (হারবাং ও বদরখালী), পেকুয়া ১টি (বারবাকিয়া), কুতুবদিয়া - নেই, মহেশখালী ১টি (কালামারছড়া), ককসবজার সদর ১টি(ঈদগাঁও), রামু ২টি (গর্জনিয়া), উখিয়া ৪টি (উখিয়া, হলুদিয়পালং, ইনানী, বালুখালী), টেকনাফ ২টি (সেন্টমার্টিন ও হ্নীলা ।

উপজেলা পর্যায়ে ৬৪টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে । তম্মধ্যে চকরিয়ায় ১৯টি, পেকুয়ায় ৫টি, মহেশখালীতে ৭টি, ককসবজার সদরে ৬টি, রামুতে ১০টি, উখিয়ায় ৪টি ও টেকনাফ উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৭৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে । এর মধ্যে চকরিয়া উপজেলাতে ৪৩টি, পেকুয়ায় ১৪টি, কুতুবদিয়ায় ১০টি, মহেশখালীতে ২৭টি, ককসবজারে ২৯টি, রামুতে ২৩টি, উখিয়ায় ১৫টি ও টেকনাফে ১২টি ।

জেলার ৮ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র , ৬৪টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ১৭৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ৮জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (বর্তমানে কর্মরত ৫জন), ২৬জন চাকমো, ৬৭ জন এফডাব্লিউভি, ১৭৮জন সিএইচপি কর্মরত আছেন ।

জেলার ৮ উপজেলার বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা ২১টি। এই গুলো হলো: চকরিয়া : ১। মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল ৫০শয্যা, ২। জমজম হাসপাতাল প্রাইভেট লিঃ ৬০শয্যা, ৩। সেন্ট্রাল হসপিটাল ১০শয্যা, ৪। মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল ১০শর্য্যা, ৫। আছিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল ২০শয্যা, ৬। সুর্য্যের হাসি ক্লিনিক এফডিএসআর ১০শয্যা, । ৭। এশিয়া হাসপাতাল প্রা: লিমিটেড ১০শয্যা। পেকুয়া : ৮। প্যান ইসলামিক হাসপাতাল প্রাইভেট লিঃ ১০শয্যা । ককসবজার: ৯। সী সাইড হাসপাতাল প্রাইভেট লিঃ ১০শয্যা, ১০। বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল ৮০শয্যা, ১১। কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল ১০শয্যা, ১২। সুর্য্যের হাসি ক্লিনিক (এফডিএসআর) ১০শয্যা, ১৩। কক্স ন্যাশনাল হাসপাতাল ১০শয্যা, ১৪। জেনারেল হাসপাতাল ২০শয্যা, ১৫। ডিজিটাল হাসপাতাল ৪০শয্যা, ১৬। ঈদগাঁও মেডিকেল সেন্টার এন্ড হাসপাতাল ২০শয্যা। ১৭। জমজম হাসপাতাল প্রাইভেট লিঃ ১০শয্যা, ১৯। মা ও শিশু হাসপাতাল ১০শয্যা। ২০। ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল ৮০শয্যা, ২১। ডায়বেটিক হাসপাতাল। ২২। রামু সুর্য্যের হাসি ক্লিনিক(এফডিএসআর) ১০শয্যা।

ব্যাংক ঃ

ককসবাজার জেলায় সরকারী/বেসরকারী মোট ৩১টি বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৯৪টি শাখা রয়েছে। এই ব্যাংক গুলোর মাধ্যমে জেলাবাসী আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করে থাকেন। ব্যাংক গুলো ভাল সার্ভিস প্রদান করছে। এই ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ সাধারণ সঞ্চয়ী আমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ,সরকারী/ বেসরকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান ও ট্রেজারী সংক্রান্ত হিসাব সেবা প্রদান করে থাকেন।

চকরিয়া উপজেলা-এই উপজেলার অধীনে বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ২০টি শাখা রয়েছে। এগুলো হল যথাক্রমে, কৃষি ব্যাংকের ৩টি শাখা, সোনারী ব্যাংক'র ৪টি শাখা এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লি:, অগ্রনী ব্যাংক লি:, এবি ব্যাংক লি:, পূবালী ব্যাংক লি:, মিচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লি:, ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি:, ঢাকা ব্যাংক লি:, ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক লি:, সাইথ ইষ্ট ব্যাংক লি:, এনসিসি ব্যাংক লি: ও যমুনা ব্যাংক লি: এর ১টি করে শাখা।

পেকুয়া উপজেলা-এই উপজেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৪টি শাখা রয়েছে। সেগুলো হলো, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক লি:, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: ও ফাষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লি: এর ১টি করে শাখা।

কুতুবদিয়া উপজেলা : অত্র উপজেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৪টি শাখা রয়েছে এবং এগুলো হলো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ২টি ও করে সোনালী ও জনতা ব্যাংকের ১টি করে শাখা রয়েছে।।

মহেশখালী উপজেলা: এই উপজেলায় বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৮টি শাখা রয়েছে । তম্মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৫ টি, এবং সোনালী, পূবালী ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ১টি করে শাখা রযেছে ।

কক্সবাজার সদর উপজেলা: এখানে সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৩৭টি শাখা রয়েছে।। সেগুলো হলো:কৃষি ব্যাংকের ৩টি, সোনালী, রূপালী ও ইসলামী বাাংক লি:এর ২টি করে শাখা ও আইএফআইসি ব্যাংক লি:, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি:, ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক লি:, এনসিসি ব্যাংক লি:, পুবালী ব্যাংক লি:, জনতা ব্যাংক লি:, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি:, ব্রাক ব্যাংক,কর্মসংস্থান ব্যাংক লি:, প্রবাসী কল্যান ব্যাংক লি:, স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লি:, উত্তরা ব্যাংক লি:, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লি:, ওয়ান ব্যাংক লি:, ফাষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লি:, ট্রাষ্ট ব্যাংক লি:, ব্যাংক এশিয়া লি:, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:, বেসিক ব্যাংক লি:, এক্সিম ব্যাংক লি:, এবি ব্যাংক লি:, ন্যাশনাল ব্যাংক লি:, সিটি ব্যাংক লি:, যমুনা ব্যাংক লি:, অগ্রনী ব্যাংক লি:, ঢাকা ব্যাংক লি: ও মিচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লি: এর ১টি করে শাখা রয়েছে ।

রামু উপজেলা: রয়েছে মোট ৬টি ব্যাংক। সেগুলো হলো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২টি, এবং ১টি করে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রূপালী, সোনালী ও জনতা ব্যাংক।

উখিয়া উপজেলা:এই উপজেলায় বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৮টি শাখা রয়েছে। সেগুলো হল : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, ফার্ষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি:, অগ্রনী ব্যাংক লি:, বাংলাদেশ কৃষি ব্যংক, সোনালী ব্যাংক লি: ও পূবালী ব্যাংক লি: এর ১টি করে শাখা রয়েছে।।

টেকনাফ উপজেলা: অত্র উপজেলায় বানিজ্যিক ব্যাংক সমুহের মোট ৮টি শাখা চলমান রয়েছে।। যেমন:বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-২টি এবং সোনালী, ইসলামী ব্যাংক লিঃ, জনতা, ঢাকা ব্যাংক লি:, অগ্রণী ব্যাংক ও আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি: এর ১টি করে শাখা রয়েছে।

পোষ্ট অফিস ঃ

ককসবাজার জেলায় এক্সট্রাঅর্ডিনারী ব্রাঞ্চ অফিসসহ মোট ৭০টি **পোষ্ট আফিস আছে**। এ গুলোর মাধ্যমে জেলাবাসী, সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্টান দৈনিক নিয়মিত চিঠি-পত্র আদান-প্রদান, মানি অর্ডার সুবিধা, ডাক বীমা, সঞ্চয় স্কীম ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া জেলায় সুন্দরবন, কন্টিনেনটাল, এস এ পরিবহন ও জেনারেল কুরিয়ার সার্ভিস সেবা চালু আছে যা দিয়ে জেলাবাসী, সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্টান দ্রুততার সহিত দৈনিক চিঠি-পত্র আদান-প্রদান, অর্থ প্রেরণ ও মালামল পরিবহন করে থাকেন।

পোষ্ট অফিস সমুহের বিবরণ নিম্নরূপ:

উপজেলা /কয়টি	পোষ্ট অফিসের নাম	সেবার ধরণ	সেবার মান
চকরিয়া-২০টি	চিরিংগা, খুটাখালী, কৈয়ারবিল, চকরিয়া, কাকরা, ডুলহাজারা, পহরছাঁদা, ফাঁসিয়াখালী, রবইতলী, ভেওলা, মানিকচর, মানিকপুর, লক্ষ্যারচর, কুমারীবাজার, ডেমুশিয়া, মকবুলাবাদ, শিকদারপাড়া, শাহারবিল, বড় ভেওলা, আাহছানিয়া মিশন, মালুমঘাট, বদরখালী, হারবাং,	দৈনিক নিয়মিত চিঠি-পত্র আদান-প্রদান, মানি অর্ডার সুবিধা, ডাক বীমা, সঞ্চয় স্কীম, ইত্যাদি	ভাল
পেকুয়া-৫টি	পেকুয়া, টেইটং হাজী বাজার, বারবাকিয়া, মগনামা, রাজাখালী		
কুতুবদিয়া-৩টি	কুতুবদিয়া , ধুরং বাজার, আলী আকবরডেইল		
মহেশখালী-৮টি	গোরকঘাটা, কালারমারছড়া, ধলঘাটা, মাতারবাড়ী, বড় মহেশখালী, শাপলাপুর, হোয়ানক, কুতুবজোম		
ককসবজার সদর-১৪টি	ককসবাজার, খুরুশকুল টাইমবাজার, ধলিরছড়া, পি. এম. খালী, বাহারছড়া, ঝিলংজা চান্দেরপাড়া, ইসলামাবাদ, ইসলামপুর, চৌফলদন্ডী, পোকখালী, ঈদগড়, নাপিতখালী বটতলী, ভারুয়াখালী, ককসবাজার সৈকত, খুরুলিয়া,		
রামু- ৫টি	রামু, কাউয়ারখোপ, জোয়ারিয়ানালা, রাবেতা		
উখিয়া- ৬টি	উখিয়া, ইনানী, চাকবৈঠা, রত্নাপালং, মরিচ্যা, বালুখালী		
টেকনাফ-৯টি	টেকনাফ, শাহপরীর দ্বীপ, সাবরাং, মিটা পানিরছড়া, হ্নীলা, মধ্য হ্নীলা নায়াপাড়া, জাহাজপুরা, রংগীখালী, সেন্টমার্টিন		

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

জেলায় মোট ২৬১টি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আপদকালীন মুর্হুতে সাধারণ জনগণের কল্যানার্থে সহযোগিতা করে থাকে। প্রতিটি ক্লাব/প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ সেবার অধীনে রেজিষ্ট্রিভূক্ত। নিম্নে একনজরে ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংখ্যা ও তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

কয়টি	কোথায় অবস্থিত	কাজের ধরণ	সমাজসেবা/উন্নয়নমূলক কাজ
২৬১টি	চকরিয়া - ৫১টি, পেকুয়া - ৯টি, কুতুবদিয়া - ১১টি, মহেশখালী-২৩টি, ককসবজার-১০৪টি, রামু- ২০টি, উখিয়া- ১৪টি, টেকনাফ- ২৯টি	জাতীয় দিবস পালন, বৃক্ষ রোপন, হাঁস মুরগী ও গরু-ছাগল পালন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য এবং বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা , ক্ষুদ্রঋণ বিতরন,

এনজিও/সেচ্ছাসেবী সংস্থা ঃ

ক্র/নং	এনজিও	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগী সংখ্যা	প্রকল্প মেয়াদকাল
১	বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বজিএস)	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ওয়াটার এবং স্যানিটেশন	৫,৭০০ জন	জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ১৪
		মাইক্রো-ক্রেডিট	৮,০০০ জন	চলমান
		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন	কক্সবাজার জেলা	জুলাই-১৩-আগষ্ট ১৪
২	পালস্ ককস্বাজার	শিশু শিক্ষা কর্মসুচী		
৩	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট	গ্রাম আদালত কার্যকরিকরণ প্রকল্প	২৫টি ইউনিয়ন পরিষদ	২০১৪ সাল
৪	রিসোর্স ইনন্টিগ্রেশন সেন্টার(রিক)	সিসিসিপি, প্রবীন অধিকার কর্মসূচী, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন	১৬,০০০ জন	সি সি সি পি-২০১৮ সাল,অন্যান্য প্রকল্প গুলো চলমান
৫	সার্ভ (SARPV)	রিকেট্স প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সহায়তা, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা ও	৫,৫০০ জন	চলমান

		ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী		
৬	মুক্তি	ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী, উপানুষ্ঠানিক ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, জলবায়ু উদবাস্তু ও ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	১২,০০০ পরিবার	চলমান
৭	ব্র্যাক	শিক্ষা কর্মসূচী	২২,১৯৬ জন	চলমান
		স্বাস্থ্য কর্মসূচী	১,৮৬৮ জন	চলমান
		ওয়াশ কর্মসূচী	৪,৮১২ জন	চলমান
		দূর্যোগ,পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মসুচী	২,০৬০ জন	চলমান
		সামাজিক ক্ষমতায়ন	৬২২ জন	চলমান
		মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচী	৪১৩৬২ জন	চলমান
		ব্র্যাক মাইক্রোফিন্যান্স	৯৪,৩১৫ জন	চলমান
		অতিদরিদ্র কর্মসূচী	৫,৬৮৮ জন	২০১০-২০১৬
৮	হোপ ফাউন্ডেশন	কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্যসেবা,গর্ভবতী মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা,নার্সিং প্রশিক্ষণ	৮০০০ জন	চলমান
৯	ওয়াল্ড ভিশন	শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৫০০০ জন	২০১৭
১০	কনসার্ন ইউনিভার্সেল	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরি সহায়তা	৫,০০০ জন	চলমান
১১	বায়তুশ শরফ	চক্ষু চিকিৎসা সেবা, আবাসিক এতিমখানা পরিচালনা, প্রতিবন্ধীদের সহায়তা কর্মসূচী,মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা কর্মসূচী,	৫০,০০০ জন প্রায়	চলমান
১২	কেয়ার বাংলাদেশ	সোহার্দ্য (দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন ও জলবায়ু পরিবর্তন), ফিশারিজ, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এন্ড নিউট্রিশান	১৮,০০০ জন	২০১৫ সাল
১৩	আই ডি এফ	ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	২৩০০ জন	চলমান
		সৌর বিদ্যুত	৪৯৮ জন	চলমান
১৪	উদ্দীপন	অতিদরিদ্র ও হতদরিদ্রদের উজ্জীবিতকরণ কর্মসুচী, ক্ষুদ্রবঋণ কর্মসূচী, সাম্য প্রজেক্ট	১৪২০০ জন	২০১৯ সাল
১৫	সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স ষ্টাডিজ (সিএন আরএস)	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	১০০০ জন	চলমান
১৬	TMSS	ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	৩৯০ জন	চলমান
১৭	এফডি এস আর	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা কর্মসূচী	৯৯,৫০০ জন	২০১৭ সাল
১৮	কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট)	ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	১০,২৫০জন	চলমান
		স্কুল ফিডিং	মহেশখালী	২০১৪-২০১৫
		প্রি-প্রাইমারী	৪২০জন	২০১৩-২০১৪
		নাগরিক সচেতনতা	মহেশখালী	২০১৪-২০১৫
১৯	হেলপ বাংলাদেশ	আইজিএ	২৪৫ জন	চলমান
		আনন্দ স্কুল	৮৭০ জন	২০১৪
		বন্ধু চুলা	২৪৪০ জন	চলমান
		পারিবাসিক সহিসংতা প্রতিরোধ	২২৪০ জন	চলমান
		নারী-শিশু পাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধ	১২০০ জন	চলমান
		ভিটিডি	২৪২৪ জন	২০১৩-২০১৪

		যুব উন্নয়ন ও নেটওয়াকিং	৩৬ জন	চলমান
২০	মেরি স্টোপস	কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য,গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা	১০,০০০জন	চলমান
২১	গণস্বাস্থ্য	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা	৮,০০০জন	চলমান
২২	এফ.পি.এ.বি.	কিশোরীদের প্রজননধা স্থ্যসেবা, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা	৫০০পরিবার	চলমান
২৩	ভিলেজ এডুকেশন রির্সোস সেন্টার (ভার্ক)	শিক্ষা ও পুষ্টি নিয়ে সরণার্থী ক্যাম্পে কাজ	৩০০০জন	২০১২-২০১৪
২৪	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	পরিবেশ ও উপকুলীয় জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	৮০০ জন	চলমান
২৫	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)	আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	সমগ্র জেলা	চলমান
২৬	আশা	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, শিক্ষা বৃত্তি	১০৯৩৬৪ জন	চলমান
২৭	প্রত্যাশী	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	৮,০০০জন	২০১২-২০১৪
২৮	মেঘনা সোস্যাল হেলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, স্বাস্থ্য কর্মসূচী	১৭৫০ জন	চলমান
২৯	সোসাইটি ফর ডেভেলফমেন্ট ইটিসিয়েটিভস্ (এস ডি আই)	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী	১১৫০০ জন	চলমান
৩০	শেড(SHED)	ইনানী রক্ষিত বনাঞ্চল সহ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৫৬০জন	২০০৯ -২০১৪
		সৌহাদ্য (দুযোগ ঝুঁকি, প্রশমন ও জলবায়ু পরির্বতন	৭৯৯৩ জন	২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত
৩১	আরটিএমআই	শরনার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ	১৩০০০ জন	২০১১-২০১৬
৩২	মুসলিম এইড	স্কুল ফিডিং	৩১২১৫ জন	২০১৩-২০১৬
৩৪	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	১৯৫০ জন	
৩৫	ঘরণী	ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ	৫০০০জন	২০১৪-২০১৫
৩৬	ব্যুরো-বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী ও মানি ট্রান্সফার	৮,০০০জন	চলমান
৩৭	পিপলস্ ওরিন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, স্বাস্থ্য	৪,০০০জন	চলমান
৩৮	বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	এইচ আই ভি প্রিভেনশন প্রজেক্ট	২,০০০ পরিবার	২০১৪-২০১৫
৩৯	একলাব	ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী, ভিজিডি	৫০০০জন	২০১২-২০১৫
৪০	আরডিএফ	শিক্ষা কর্মসূচী, মাইক্রো ক্রেডিট	৮,০০০জন	চলমান
৪১	Transparency International Bangladesh (TIB)	দুর্নীতি প্রতিরোধ	চকরিয়া	চলমান

৪২	সিলেট যুব একাডেমী	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী, বিভিন্ন দিবস পালন	৬০০জন	চলমান
৪৩	শক্তি ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	৪,০০০জন	চলমান
৪৪	PULSE Bangladesh	IPT নাট্যদলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান শিক্ষা, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ	১,০০০জন	চলমান
৪৫	নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (সিএনআরএস)	উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	২,০০০জন	চলমান
৪৭	আনন্দ	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	৩,৫০০জন	চলমান
৪৬	উবিনীগ	উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন	২,০০০জন	চলমান
৪৭	Action Contre La Fame(ACF)	রাহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা	৩,০০০জন	চলমান
৪৮	দুর্জয় নারী সংঘ	পতিতাদের স্বাস্থ্য ও এইডস সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি		চলমান
৪৯	হীড বাংলাদেশ			চলমান
৫০	নোঙর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন	৭০০ জন	চলমান
৫১	সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল	ওয়াটার ও সেনিটেশন		
৫২	প্রশিকা	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	৫,৫০০জন	চলমান
৫৩	খান ফাউন্ডেশন			
৫৪	দি লেপ্রসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল	কুষ্ঠ রোগ নিরসন প্রকল্প	৫০০জন	চলমান
৫৫	গ্রীণ কক্সবাজার			
৫৬	আজাদ	ভিজিডি প্রোগ্রাম	২,৫০০জন	চলমান
৫৭	এক্সপেউরুল	শিশু শিক্ষা, আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার, লিগ্যাল এড সার্পোট, এইচ আইভি ও জলবায়ু পরির্বতন	১,০০০পরিবার	চলমান
৫৮	বাস্তব	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচী	৪০০০ জন	চলমান
৫৯	ইসলামিক রিলিফ-ওর্য়াল্ড ওয়াইড	পুনর্বাসন ও রিলিফ	১০০০ জন	চলমান

খেলার মাঠঃ

কক্সবাজার জেলায় মোট ১৮২টি খেলার মাঠ রয়েছে। নিম্নে উপজেলা ভিত্তিক সংখ্যা তুলে ধরা হলো।

চকরিয়া উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড় ৪৫টি খেলারমাঠ রয়েছে। চকরিয় সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চকরিয়া কেন্দ্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠ মাঠ, পালাকাটা উচ্চ বিদ্যায় মাঠ, কিশালয় আর্দশ শিক্ষা নিকেতন মাঠ, খুটাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কচ্চফিয়া খেলার মাঠ, ডুলাহাজারা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ডুমখালী ক্রীড়াচক্র খেলার মাঠ, ডুলাহাজারা খৃ: মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চা-বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, রং মহল প্রা: বিদ্যালয় মাঠ, মাইজপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার খেলার মাঠ, পূর্ব ডুমখালী খেলার মাঠ, ডুলাহাজারা কলেজ মাঠ, ফাঁসিয়াখালী রশিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, তুলাতলী খেলার মাঠ, পুকপুকুরিয়া প্রা: বিদ্যালয় খেলার মাঠ, বদরখালী কলোনীজেসেশন উচ্চ বিদ্যালয়, বদরখালী কলেজ মাঠ, আল আজাহার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, দরবেশ কাটা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ইলিশিয়া জমিলা বেগম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ডেমুশিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, শাহারবিল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, নুরুল আমিন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, শাহারবিল মাদ্রসা মাঠ, জে এম মিশনারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, সিকদারপাড়া খেলার মাঠ, বিএমচর উচ্চ বিদ্যালয়, বহাদ্দারকাটা উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, কোটাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চকরিয়া কলেজ মাঠ, লক্ষ্যরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় খেলার মাঠ, শাহামোরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, কাকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাকারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, দক্ষিন মানিক পুর প্রা: বিদ্যালয় মাঠ, কৈয়ার বিল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, বরইতলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, বরইতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, দাড়িবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ। দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে এই মাঠ গুলো ব্যবহার করা হয়।

পেকুয়া উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড় ১২টি খেলারমাঠ রয়েছে। পেকুয়া ষ্টেডিয়াম, জিয়াউর রহমান উপকুলীয় কলেজ মাঠ, বারবাকিয়া কমিউনিটি সেন্টার মাঠ, রাজাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ফয়জুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, রাজাখালী জুনিয়র বিদ্যালয় মাঠ, টেইটং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, টেইটং বটতলী খেলার মাঠ, টেইটং সোনাইচরী প্রা: বিদ্যালয় মাঠ, শীলখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, শীলখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, মগনামা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ। দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা যায় ।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ উপজেলায় মোট ২০টি মাঠ রয়েছে। উত্তর ধুরং ইউনিয়নে আকবরবলিরপাড়া ইফাদ কেল্লার মাঠ ছামদিয় আলিম মাদ্রাসা মাঠ, উত্তরণ বিদ্যানিকেতন মাঠ, কালারমাপাড়া ইফাদ কেল্লার মাঠ, মগলালপাড়া ইফাদ কেল্লা মাঠ, দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নে পেচার বাপের পাড়া ইফাত কেল্লার মাঠ, ধূরং কাঁচা ইফাত কেল্লার মাঠ, ধূরং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, লেমশীখালী ইউনিয়নে গাইনাকাটা ইফাত কেল্লার মাঠ, সতর উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, আশাহাজীরপাড়া ইফাত কেল্লা মাঠ, লেমশীখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে উত্তর কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লার মাঠ, কৈয়ারবিল আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্য কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লার মাঠ, খিলাছড়ি ইফাদ কেল্লা মাঠ, বড়ঘোপ ইউনিয়নে কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, মগডেইল পুরাতন সাইক্লোন সেন্টার মাঠ, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে আলী আকবর ডেইল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, হায়দার পাড়া ইফাত কেল্লার মাঠ, সন্দীপিপাড়া ইফাত কিল্লা মাঠ, মশরফ আলী সিকদারপাড়া মাঠ। দুর্যোগকালীন সময় ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার এবং দুযোর্গ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণে ব্যবহার করা হয়।

মহেশখালী উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড় ২৯টি খেলারমাঠ রয়েছে। কুতুবজোম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, অপসুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কুতুবজোম জামেয়ুসুন্নাহ দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা মাঠ, বড়মহেশখালী নতুন বাজর মাঠ, বড় ডেইল মাদ্রাসা মাঠ, মুন্সির ডেইল মাঠ, নতুন বাজার প্রা: বিদ্যালয় মাঠ, ছোট মহেশখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, সুতরীয়া প্রাইমারী স্কুলের মাঠ, হোয়নক টাইম বাজার স: প্রা: বি: মাঠ, হোয়নক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, পানির ছড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, হোয়াসক রশিদিয়া মাদ্রাসা মাঠ, হোয়ানক কজেল মাঠ, ইউনুছখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, কালরমারছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, নুনাছড়ি কমিউনিটি সেন্টার মাঠ, উত্তর নলবিলা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, নোনাছড়ি মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা মাঠ, মিজ্জিরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, মহেশখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, মহেশখালী ডিগ্রি কলেজ মাঠ, গোরকঘাটা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, চর পাড়া খেলার মাঠ, শাপলাপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, দ্বিনেশপুর মাঠ, শাপলাপুর মাদ্রাসা মাঠ, দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে।

কক্সবাজার সদর উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড় ২০ টি খেলারমাঠ রয়েছে। ককসবজার ষ্টেডিয়াম, ককসবাজার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, বাহারছড়া খেলার মাঠ, ককসবাজার আন্তজাতিক ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম, ঝাউতলা মাঠ, টেকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, পৌর প্রিপ্যারেটরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, হাশেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মাঠ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আফিস খেলার মাঠ, খরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, খুরুশকুল উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, খুরুশকুল মড়েল বিদ্যালয়, দক্ষিন খুরুশকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিএমখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ঈদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ককসবাজার সরকারী কলেজ খেলার মাঠ, ঈদগাঁও ফরিদ আহমদ কলেজ মাঠ, ছুরতিয় মাদ্রাসা খেলার মাঠ, চৌফলদন্ডি উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, গোমাতলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, ভারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ, পোকখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ। দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

রামু উপজেলাঃ উপজেলায় মোট ১৫টি মাঠ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য স্কুল ও খালি জায়গায় ছোট ছোট খেলার মাঠ রয়েছে। **ঈদগড় ইউনিয়নে ২টি** কোনারপাড়া মাঠ ও কাটাজঙ্গল হিল্লামুড়া মাঠ, **কাউয়ারখোপ ইউনিয়নে ২টি,** কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও মনিরঝিল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ, **খুনিয়াপালং ২টি** দারিয়ারদিঘী প্রাইমারী স্কুল মাঠ ও রাবেতা হাসপাতাল মাঠ, জোয়ারিয়ানালা ১টি জোয়ারিয়ানালা এইচ, এম হাকিম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, **দক্ষিণ মিঠাছড়ি ২টি** দঃ মিঠাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও চেইন্দা রোশন আলী উচ্চ বিদ্যালয়, **রাজারকুল ২টি** নয়াপাড়া মনসুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুল ও ছাগলিয়াকাটা খেলার মাঠ, **রশিদনগর ২টি,** রশিদনগর নাদেরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় ও উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়, **ফতেখাঁরকুল ২টি** রামু খিজারি মাঠ, পোষ্ট অফিস মাঠ, মন্ডল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা,ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

উখিয়া উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড়া ২৫টি খেলারমাঠ রয়েছে। সোনাইছড়ী খেলার মাঠ, সোনারপাড়া উচ্চ বি: মাঠ, নিদানিয়া সৈকত মাঠ, বাদামতলী এবতেদায়ী মাদ্রাসা মাঠ, নিদানিয়া স:প্রা:বি মাঠ, ভালুকিয়া স: প্রা: স্কুলের মাঠ, পালং আদর্শ উ:বি: খেলার মাঠ, মরিচ্যা পালং উচ্চ বি: মাঠ, চন্ডবানিয়া খেলার মাঠ, গোরাইয়ার দ্বীপ স: প্রা:বি: মাঠ, উ: বড়বিল স: প্রা: বি: মাঠ, পাতাবাড়ি স: প্রা: বি: মাঠ, নলবনিয়া স: প্রা: বি: মাঠ, হিলটস স: প্রা: মাঠ, চন্দ্রবনিয়া খেলার মাঠ, চৌধুরী পাড়া স: প্রা:বি মাঠ, দরগাহ পালং স: প্রা:বি:মাঠ, উখিয়া উচ্চ বি: মাঠ, উখিয়া ডিগ্রী কলেজ মাঠ, উখিয়া মডেল স:প্রা:বি মাঠ, রাজাপালং এ, কে, সি উচ্চ বি:, উখিয়া পাতাবাড়ি খেলার মাঠ, থেইং খালী উচ্চ বি: মাঠ, বালুখালী উচ্চ খেলার মাঠ, পালংখালী উচ্চ খেলার মাঠ। দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা যায় ।

টেকনাফ উপজেলাঃ উপজেলায় ছোটবড় ১৬ টি খেলারমাঠ রয়েছে। টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, টেকনাফ আর্দশ কেজি স্কুল মাঠ, টেকনাফ কলেজ মাঠ, টেকনাফ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ, বিজিবি পাবলিক স্কুল মাঠ, হ্নীলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, হ্নীলা বালিকা উচ্চ

বিদ্যালয় মাঠ, সাবরাং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, সাবরাং বশির আহমদ উচ্চ বিদ্যায় মাঠ, রঙ্গীখালী মাদ্রাসা মাঠ, সেন্টমার্টি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রর মাঠ, হোয়াক্যং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, হোয়াক্যং ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ, বাহারছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, জাহাজপুরা প্রা: বিদ্যালয় মাঠ, দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা যায়।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট ঃ

কবরস্থান / শ্মশানঘাটঃ ককসজার জেলায় মোট ২,২২২টি কবরস্থান ও শ্মশানঘাট আছে এর মধ্যে কবরস্থান ১,৯৬৭টি ও শ্মশান ২৫৫টি। নিম্নে উপজেলা অনুযায়ী প্রদান করা হলো।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ কুতুবদিয়া উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে মোট ১০৯টি কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট আছে। কবরস্থান ১০০টি, শ্মশানঘাট ৯টি, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে কবরস্থান ৯টি, শ্মশানঘাট ১টি, দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নে কবরস্থান ১৫টি, শ্মশানঘাট ১টি, লেমশীখালী ইউনিয়নে কবরস্থান ২৭টি, শ্মশানঘাট ১টি, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে কবরস্থান ৯টি, শ্মশানঘাট ১টি, বড়ঘোপ ইউনিয়নে কবরস্থান ১০টি, শ্মশানঘাট ৪টি, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে কবরস্থান ৩০টি, শ্মশানঘাট ১টি। এগুলো বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে থাকে।

মহেশখালী উপজেলাঃ রামু উপজেলায় মোট ৩০৯টি কবরস্থান ও শ্মশানঘাট আছে এর মধ্যে কবরস্থান ২৮৪টি শ্মশান ২৫টি। নিম্নে উপজেলা অনুযায়ী তা দেওয়া হলো। কুতুজজুম ইউনিয়নে কবরস্থান ৪০টি, শ্মশান নেই, বড় মহেশখালী ইউনিয়নে কবরস্থান ৬০টি, শ্মশান ১টি, ছোট মহেশখালী ইউনিয়নে কবরস্থান ৩৪টি, হিন্দুদের শ্বশান ৪টি(আদিনাথ মন্দির শ্বাশান, ঠাকুরতলা মহাশ্বাশান, জলদাশপাড়া শ্বাশান, পশ্চিম ঠাকুর তলা শ্বশান, বৌদ্ধ শ্বাশাণ মুদরিছড়া), ধলঘাটা ইউনিয়নে কবরস্থান ১৮টি, শ্মশান ১টি ৭নং ওয়ার্ডে, হোয়ানক ইউনিয়নে কবরস্থান ৫৫টি, শ্মশান ৭টি(হরিয়ার ছড়া, পুঁইছড়া, বড়ছড়া ও কেরুনতলী), কালারমারছড়া ইউনিয়নে কবরস্থান ৩৭টি, শ্মশান ৩টি(উত্তর নলবিলা,ইউনুছ খালী ও সামিয়া ঘেনায়), মাতারবাড়ী ইউনিয়নে কবরস্থান ২৭টি, শ্মশান ১টি লাইল্যা ঘোনায়, শাপলাপুর ইউনিয়নে কবরস্থান ৩০টি, শ্বশান ১টি হিন্দু শ্বাশান, বৌদ্ধ শ্বাশান ১টি এবং মহেশখালী পৌরসভায় কবরস্থান ১০টি, শ্মশান ৬টি। এগুলো বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে থাকে।

রামু উপজেলাঃ রামু উপজেলায় মোট ৩২৬ টি কবরস্থান ও শ্মশানঘাট এর মধ্যে **কবরস্থান -২৮৫টি ও শ্মশান ঘাট (হিন্দু ও বৌদ্ধ) ৪১টি। উপজেলার** ঈদগড় ইউনিয়নে কবরস্থান ১৫টি, শ্মশানঘাট ২টি, কাউয়ারখোপ ইউনিয়নে কবরস্থান ১৪টি, শ্মশানঘাট ৩টি, খুনিয়াপালং ইউনিয়নে কবরস্থান ৪২টি, শ্মশানঘাট ২টি, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নে কবরস্থান ৩৪টি, শ্মশানঘাট **২টি,** কচ্ছপিয়া **ইউনিয়নে** কবরস্থান ৪৪টি, শ্মশানঘাট ৫টি, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নে কবরস্থান ২১টি, শ্মশানঘাট ৩টি, গর্জনিয়া ইউনিয়নে কবরস্থান ৩৩টি, শ্মশানঘাট ৩টি, রাজারকুল ইউনিয়নে কবরস্থান ২৩টি, শ্মশানঘাট ৫টি, চাকমারকুল ইউনিয়নে কবরস্থান ১৪টি, শ্মশানঘাট ২টি, রশিদনগর ইউনিয়নে কবরস্থান ২০টি, শ্মশানঘাট ১টি, ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নে কবরস্থান ২৫টি, শ্মশানঘাট ১৩টি। এগুলো বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে থাকে।

ক্সবাজার সদর উপজেলাঃ সদর উপজেলায় মোট ৩৬৮টি কবরস্থান ও শ্মশানঘাট এর মধ্যে **কবরস্থান -৩০৫টি ও শ্মশান ঘাট ৬৩টি। উপজেলার** ঝিলাংজা, পাতলী মাছুয়া খালী, খুরুশকুল, চৌপলদন্ডি, ভারুয়াখালী, পোকখালী, ঈদগাঁও, জালালবাদ, ইসলামাবাদ, ইসলামপুর ইউনিয়ন এবং কক্সবাজার পৌরসভা অবস্থিত। এগুলো বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে থাকে।

পেকুয়া উপজেলাঃ পকুয়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে মোট ৫৯টি কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট আছে। কবরস্থান - ৫৫টি পেকুয়া সদর, রাজাখালী, বারবাকিয়া, মগনামা, টইটং, উজানটিয়া, শিলখালী ইউনিয়নে অবস্থিত। শ্মশানঘাট- ৪টি (মগপাড়া, হিন্দুপাড়া, পেকুয়া, টেইটং নাপিতপাড়া)। বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।

চকরিয়া উপজেলা ঃ চকরিয়া উপজেলার মোট ৬১১টি কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট আছে এর মধ্যে কবরস্থান - ৫৬০টি, শ্মশানঘাট- ৫১টি। এই গুলো উপজেলা ১৮টি ইউনিয়ন খুটাখালী, ডুলহাজারা, ফসিয়াখালী, বমু বিলছড়ি, সুরাজপুর মানিকপুর, কাকারা, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা, কৈয়ারবিল, বরইতলী, হারবাং, শাহারবিল, পূর্ব বড় ভেওলা, ভেওলা মানিকচর, কোনাখালী, বদরখালী, পশ্চিম বড় ভেওলা, ডেমুশিয়া ইউনিয়ন এবং চকরিয়া পৌরসভা অবস্থিত। বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।

উখিয়া উপজেলা ঃ উখিয়া উপজেলায় মোট ২০৩ টি কবরস্থান ও শ্মশানঘাট এর মধ্যে ১৭৫টি করবস্থান ৯টি হিন্দু শ্মশান ও ১৯টি বৌদ্ধ শ্মশান। জালিয়াপালং ইউনিয়নে কবরস্থান-৩০টি, হিন্দু শ্মাশান- নাই, বৌদ্ব শ্মাশান- ৩টি ১, ৭ ,৮নং ওয়ার্ডে, রত্নাপালং ইউনিয়নে কবরস্থান- ২৯টি হিন্দু শ্মাশান- নাই, বৌদ্ব শ্মাশান- ১টি, হলদিয়াপালং ইউনিয়নে কবরস্থান- ৪১টি, হিন্দু শ্মাশান-২টি, বৌদ্ব শ্মাশান-৮টি, রাজাপালং ইউনিয়নে কবরস্থান-৫৭টি, হিন্দু শ্মাশান-৫টি, বৌদ্ব শ্মাশান-৫টি, পালংখালী ইউনিয়নে কবরস্থান- ১৮টি, হিন্দু শ্মাশান-২টি, বৌদ্ব শ্মাশান-২টি। এগুলো বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে থাকে।

টেকনাফ উপজেলাঃ উপজেলায় উপজেলার মোট ২৩৭টি কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট আছে এর মধ্যে কবরস্থান - ২০৩টি, শ্মশানঘাট- ৩৪টি। এই গুলো উপজেলার হোয়াইক্যং, হ্নীলা, **টেকনাফ সদর,** সাবরাং, বাহারছড়া, সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন এবং টেকনাফ পৌরসভা অবস্থিত। বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।

বন ও বনায়ন ঃ

কক্সবাজার জেলায় সরকারী সংরক্ষিত বনভুমি প্রায় ১,৬২,৪৯২.৪৬একর। সরকারি রক্ষিত বনভুমি প্রায় ৩৩,০২০.১৮ একর। **সামাজিক বনায়ন** প্রায় ৫৭,৪৮৯.৭৬ একর। প্রাকৃতিক বনভুমি প্রায় ১৯,৪০৭.৮১একর। এইসব বনে একাশিয়া, বাম, বেত, আগর, সেগুন, মেহগনি, গর্জন, অর্জুন, ম্যালেরিয়া গাছ প্রভৃতি গাছের সংখ্যা বেশী। জেলায় ব্যক্তিগত বাগানের পরিমাণ প্রায় ৫,০০০একর।

গাছ ঃ জেলার বিভিন্ন বনে, পাহাড়ে, প্যারাবনে, ঝাউবনে সাধারণত: গর্জন, অর্জুন, আকাশমনি, কড়ই, তেলসুর, তুলা, মুছ, বাঁশ, একাশিয়া, বাম, বেত, মেনজিয়াম, বট, সেগুন, রেইনট্রি, মেহগনি, জারুল, ছাতিম, ঝিল, ভুতকড়ি, মাদার, তেতুল, নিম, ঝাউগাছ, বাইন, ম্যানগ্রুভ প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

লতাগুল্ম/ঝোপ ঃ জেলার বিভিন্ন বনে সাধারণত: পাথরকুচি, লজ্জাবতি, গোয়াইচ্যা লতা, আদাগুনগুনি (থানকুনি), তুলসি, বাশক, ফনিমনসা, বিন্যাঘাস, স্বর্নলতা, দূর্বা, অর্কিড (পরগাছা),বেত,পান, কেয়া, ছন প্রভৃতি লতাগুল্ম / ঝোপ দেখতে পাওয়া যায়।
ফুল ঃ জেলায় কাঠালিচাঁপা, শিউলী, বেলী, গাঁদা, জবা, কৃষ্ণচূড়া, হাসনাহেনা, জুঁই, গোলাপ, কামিনী, চম্পা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, পাতাবাহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জলজ উদ্ভিদ: কচুরিপানা, পদ্ম, আমরনি, শাপলা, শেওলা, উলুখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম ঃ

কক্সবাজার জেলার সাথে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভাল এবং বিভিন্ন মাধ্যমে এই যোগাযোগ রয়েছে। এর সাথে কক্সবাজার জেলার আভ্যন্তরীণ উপজেলা শহরের সাথেও জেলার শহরের যোগাযোগের অনেকগুলো সুবিধাজনক মাধ্যম বিদ্যমান।

বিভাগীয় শহরের সাথে যোগাযোগ ঃ

কক্সবাজার জেলার সাথে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরের যোগাযোগের অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। সড়ক পথে প্রতিনিয়ত বাস, মাইক্রোবাস, জীপ, ট্রাক চলাচল করছে। আকাশ পথে রয়েছে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ। প্রায় প্রতিদিনই চটগ্রামের সাথে কক্সবাজার জেলার সদরে বিমান চলাচল রয়েছে। সড়ক পথে কক্সবাজার শহরের বদ্দারহাট হয়ে কক্সবাজারে সরাসরি আসতে পারে। এছাড়াও চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে সরাসরি লঞ্চেও কক্সবাজারে শহরে আসা সম্ভব।

জেলার অভ্যন্তরে উপজেলার সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ঃ

কক্সবাজার জেলা সদর এর সাথে জেলার মোট ৮টি উপজেলার মধ্যে কুতুবদিয়া উপজেলা ব্যতীত অন্য সব উপজেলার সাথে জেলার সদরের সাথে সরাসরি সড়ক পথে যোগাযোগের ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। কক্সবাজার জেলা শহর থেকে উখিয়া, টেশনাফ, রামু, চকোরিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া উপজেলার সাথে বাস, ট্রাক, জীপ, মাইক্রাবাস, সিএনজি, মটরসাইকেল যোগে সরাসরি যাতায়াত করতে পারে। এছাড়া মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলার সাথে নৌ-পথে সরাসরি যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। উপজেলা শহরগুলোতে জীপ, মাইক্রো, সিএনজি, মটর সাইকেল, টমটম, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

জেলার সাথে বিমান যোগাযোগ ঃ

কক্সবাজার বিমান বন্দর হতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিমান বন্দরে বিমান যোগে সরাসরি যাতায়াত করা যায়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স, রিজেন্ট এয়ারলাইন্স, ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স, এভিএয়ার এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য বিমান বন্দর হয়ে বিমানযোগে যাতায়তের ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৪.৩. আবহাওয়া ও জলবায়ু

ককসবাজার জেলার আবহাওয়া অফিসের অধিনে কুতুবদিয়া, টেকনাফ, সেন্টমার্টিনসহ ৩টি প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়ার পর্যবেক্ষন কেন্দ্র, আছে। হিলটপ সার্কিট হাউজ সংলগ্ন ১টি রাডার ষ্টেশন ও বিমান বন্দরে ১টি অ্যারোম্যাট শাখা রয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বিমান চলাচলের জন্য পূর্বাভাস, বিশেষ আবহাওয়া পূর্বাভাস, জোয়ার ভাটার সময় সুচী ও সূর্যোদয় ও সূর্যস্তের সময়সূচী সুবিধা সমূহ প্রদান করেন।

সর্তকতা ও দুর্যোগ পর্যায়ে সংকেত প্রচার ঃ দুর্যোগ পর্যায়ে ২৪ঘন্ট পূর্বে সর্তক সংকেত, কমপক্ষে ১৮ঘন্টা পূর্বে বিপদ সংকেত, কমপক্ষে ১০ঘন্টা পূর্বে মহাবিদ সংকেত প্রচারসহ অনেক গুরুত্ব পূর্ণ বার্তা প্রচার করে থাকে।

সংকেত বার্তা সমূহের তথ্যাদি ঃ ঝড় কেন্দ্রের অবস্থান, দিক ও চলনের গতি, জেলা ও উপজেলা নাম উল্লেখ পূর্বক ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে এমন এলাকা নির্নয়, প্রবল বাতাস হওয়ার কাছাকাছি সময়, প্রত্যাশিত সর্বাধিক বাতাসের গতি, জলোচ্চাস, জোয়ার, স্রোতের সম্ভাব্য উচ্চতা এবং জেলা ও উপজেলা সমূহের নাম উল্লেখ পূর্বক আঘাত হানতে পাওে এমন এলাকা সমূহ নির্নয়।

বৃষ্টিপাতের ধারা ঃ ১৯৯১ সালের পূর্বে ককসবাজার জেলার বৃষ্টিপাতের ধারা একটি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিদ্যমান ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে নিয়মিত বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঋতুভেদে বৃষ্টির পরিমাণ, ধারা এবং স্থায়ীত্বকাল সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, ১৯৯৪ সালের পর থেকে হঠাৎ করে বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিক ধারা হিসাবে মাঘ মাস থেকে বৈশাখ মাসের আগে তেমন বৃষ্টি হতো না। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে হঠাৎ করে ভারি বৃষ্টি শুরু হত। গত ১০/১২ বছর যাবৎ বৃষ্টিপাতের ধারার এ পরিবর্তনে ফসল এবং জনজীবনের উপর বিরূপ প্রভাব করে চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান ও পান উৎপাদন। স্থানীয় জনগণের মতে বিগত ৫-৭ বছর থেকে বৃষ্টিপাতের আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন পূর্বে পৌষ

মাসে বৃষ্টি হত কিন্তু বর্তমানে এই হঠাৎ বৃষ্টি বা মৌসুমী বৃষ্টি আর হয় না। আবার কখনও লাগাতার ১০-১৫ দিন লাগাতার অবিরাম বৃষ্টি হয় তখন আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়।

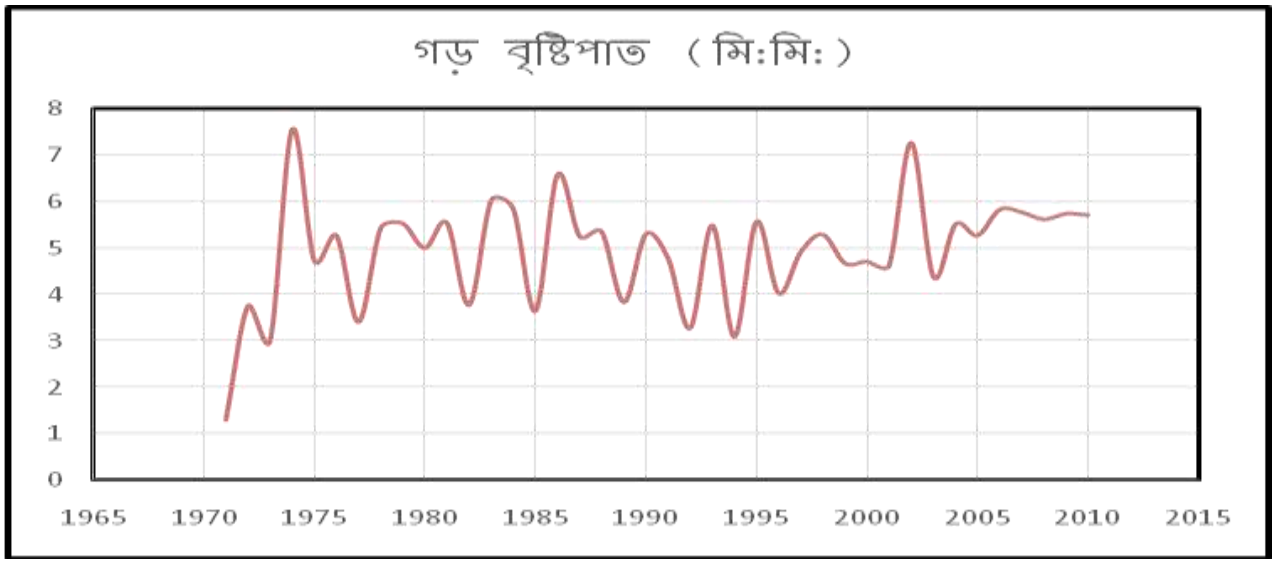

তাপমাত্রা ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রার উপর এক আমুল পরিবর্তন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ১৯৯১ সালের পর থেকে তাপমাত্রার আমুল পরিবর্তন অর্থাৎ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রতিয়মান হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় এই তাপমাত্রার তারতম্যের কারণ বলে এলাকার সচেতন জনগণ মনে করে। সম্প্রতি বছরগুলোতে চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়ে এই জেলায় সর্বত্র অসহ্য গরম অনুভূত হচ্ছে। স্থানীয় আবহাওয়া অফিস তথ্যসূত্র মতে এই সময় তাপমাত্রা ৩১° সেলসিয়াস থেকে প্রায় ৪১° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

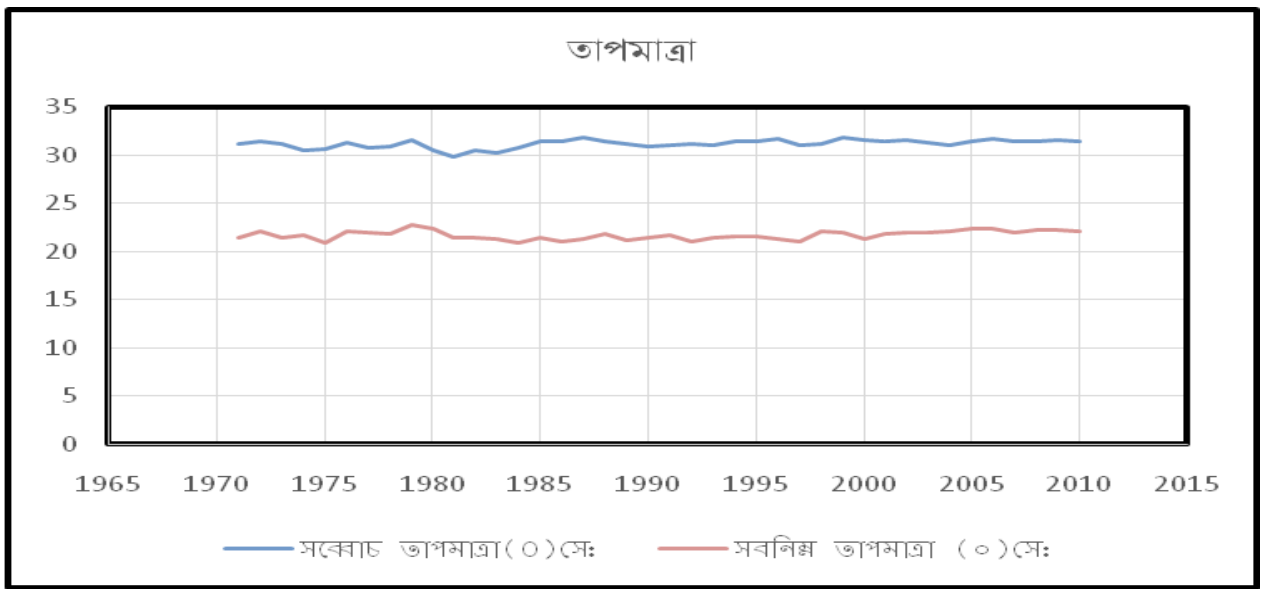

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঃ

কক্সবাজার জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৮টি উপজেলা বা ইউনিয়ন ভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে বিগত ১৫ বছর সময়ের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর একটি বিশাল পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অগভীর নলকুপের ক্ষেত্রে পূর্বে যেসব এলাকায় ৫০ ফুট গভীরে সুপেয় পানি পাওয়া যেতে সেই জাগয়ায় বর্তমানে ১০০-১৫০ ফুটের কমে সুপেয় পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। গভীর নলকুপের ক্ষেত্রে যে সব এলাকায় ৫০০-৭০০ফুট গভীরে সুপেয় পানি পাওয়া যেত সে সব এলাকায় বর্তমানে ৭০০-৯০০ফুট গভীরে

সুপেয় পানির পাওয়া যায়। ১৫বছর পুর্বে তুলনায় বর্তমানে পানির স্তর নেমে গেছে প্রায় ২০০ফুট। উল্লেখ্য যে, জেলার ২২টি মত ইউনিয়নে সুপেয় খারার পানির জন্য ৮০০ - ১১০০ ফুট গভীরে যেতে হয়।

১.৪.৪ অন্যান্য ঃ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ

কক্সবাজার জেলার ভূমির বৈচিত্রতা রয়েছে। এখানে রয়েছে উচু পাহাড়, সমতল ভূমি, নীচে এলাকা, সমদ্র সৈকত, উচু-নীচু জমি এবং অসমতল টিলা ইত্যাদি। সেইসাথে একফসলী জমির পরিমান খুব কম যেখানে তিনসফলী জমির পরিমান সবচেয়ে বেশী। জেলায় কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ককসবজার সদর ও টেকনাফ উপজেলায় লবন চাষ হয়। জেলায় রয়েছে চিৎড়ী, পান চাষের জমি যা মানুষের জীবিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জেলার খাতওয়ারী ভূমির ব্যাবহার ও পরিমান প্রদান করা হলো ঃ

মোট ভূমির পরিমাণ	ঃ	৬,১৫,৪৮৯.৪২ একর
আবাদী ভূমির পরিমাণ	ঃ	২,২০,৪,০৯৫ একর
অনাবাদী ভূমির পরিমাণ	ঃ	১২,২৬৮ একর
বনভুমি	ঃ	২,২৬,৯৯৮ একর
একফসলী	ঃ	৩৯,৫৬৮ একর
দোফসলী	ঃ	১,৭১,১৬৮ একর
তিন ফসলী	ঃ	৬৪,৯৩৬ একর
লবন চাষ	ঃ	৬৯,৩৭৫ একর
চিংড়ী চাষ	ঃ	৭২,০০০ একর
পান চাষ	ঃ	৭,৬৫৭ একর
তামাক চাষ	ঃ	৭,০০০ একর

নিচে ছক আকারে উপজেলা ভিত্তিক জমির পরিমাণ ও ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলোঃ

উপজেলা	জমির পরিমাণ (একর)		জমির ব্যবহার (একর)		
	আবাদী	অনাবাদী	একফসলী	দোফসলী	তিনফসলী
চকরিয়া	৫৪,৮৯১	৩,১১২	৩,৬০৩	৬১,৭৫০	৪৭,৬৫৪
পেকুয়া	২০,৯৯৫	২৪৭	৩,২৮৫	১৪৮৪৫	২,২৭২
কুতুবদিয়া	১৩,৪৯৬	৪০৭	৮৬৪	৭,৬০৭	৫,০২৫
মহেশখালী	২৬,২৬৪	৭০৪	৬,৭৫৫	১৮,০০১	১,৫০৬
ককসবজার সদর	২৫,৫৬৫	২২৫	৬,৪২২	১৮,২৭৮	৭৪১
রামু	২৩,৯৫৯	৩,২১১	২,২২৩	১৯,২৬৬	২,৪৭০
উখিয়া	২৬,৪৩১	৩,৯৪২	৪,২৮০	১৯,৫০৩	২,১৫৪
টেকনাফ	২৮,৪৯৪	৪২০	১২,২২৬	১১,৯১৮	৩,১১৪
মোট	২,২০,০৯৫	১২,২৬৮	৩৯,৬৫৮	১,৭১,১৬৮	৬৪,৯৩৬

কৃষি ও খাদ্য ঃ

জেলার লোকজনের প্রধান পেশা কৃষি। জেলার অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস চাস/ আহরণ, লবন চাষ ও কৃষির (ধান, পান) উপর নির্ভশীল। জেলার অধিবাসীরা মহেশখালী, চকরিয়া, ককসবাজার সদর, রামু, পেকুয়া ও উখিয়া উপজেলায় ৭,৬৫৭ একর জমিতে পান চাষ , কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া চকরিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় প্রায় ৭২,০০০ একর জমিত চিংড়ি চাষ এবং ৬৯,৩৭৫একর জমিতে লবন চাষ হয় এর বিসিক এর তথ্য মতে লবন উৎপাদনের পরিমাণ ১৭,৬৩,০০০ মে. টন এবং লবন চাষীর পরিমান ৪২,৪৮২জন এবং বিভিন্ন মৌসুম ভিত্তিক সবজী চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কৃষি জমিতে যে সকল ফসল উৎপাদন হয় তা হলো ঃ আউশ ও আমন, রোপা আমন ও বোরো, আঁখ, আলু, পেয়াঁজ, মরিচ, বেগুন, পান, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি । চকরিয়া ও রামু উপজেলায় প্রায় ৭,০০০একর জমিতে তামাক চাষ হয়। পাশাপাশি অর্থকরী ফসলের মধ্যে পান, লবন, ধান ও চিংড়ি ইত্যাদি চাষবাদের উপর নির্ভশীল। তবে জেলার একটি বিরাট অংশের মানুষ মৎসজীবি যারা বঙ্গোপসারে মাছ ধরে এবং শুস্ক মৌসুমে শুটকি মাছ উৎপাদনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

জেলায় প্রাধান ফসল ঃ

অর্থকরী ফসল ঃ ধান, পাট, আঁখ, লবন, মাছ, পান ও সুপারী।

শাক-সব্জী সমূহ ঃ টমেটো, আলু, বেগুন, মুলা, শিম, তিতাকরলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, চিচিংগা, লালশাক, কলমি, ফেলন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, রাইশাক, ঢেঁড়শ, পালংশাক, শসা, ইত্যাদি ।
ফল সমূহ ঃ তরমুজ, বাঙ্গী, আম, পেয়ারা, আনারস, জাম, কুল, বেল, নারিকেল, পেঁপে, তাল, কাঠল, কলা, জলপাই, ষ্ট্রবেরী ইত্যাদি ।

নদী ঃ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া, মহহেশখালী, রামু, ককসবাজার সদর, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মোট ৫টি নদী আছে এবং ১টি চ্যানেল আছে। নদী গুলো হলো ঃ ১ । মাতামুহুরী, ২ । কোহেলিয়া ৩ । বাঁকখালী, ৪ । রেজু, ৫ । নাফনদী এবং কুতুবদিয়া চ্যানেল ।

মাতামুহুরী নদী ঃ বাংলাদেশ মায়ারমার সীমান্তের লুসাই পাহাড় গুচ্ছ থেকে উৎপান্ন হয়ে পার্বত্য আলী কদম উপজেলার উপর দিয়ে চকরিয়া উপজেলার সুরজপুর মানিক পুর ইউনিয়নে প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে চকরিয়া উপজেলার পৌরসভা, শাহারবিল, কাকারা, ফাঁরিয়াখালী, ভেওলামনিকচর, বদরখালী ইউনিয়ন পাশ দিয়ে কোহেলিয়া পড়েছে। শুস্ক নদীটি হতে চকরিয়া উপজেলা দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫কিলোমিটার ।

কোহেলিয়া নদী ঃ ককসবাজার ও মহেশখালী চ্যানেলের দক্ষিন দিক দিয়ে বঙ্গোপসার হতে শুরু হয়ে মহেশখালী মূল দ্বীপের ৬টি ইউনিয়ন ১টি পৌরসভার চারদিকে প্রবাহিত হয়ে উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনেয়নের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে এবং নদীটি উত্তর পশ্চিম দিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলে পাড়েছে। কোহেলিয় নদীটি মহেশখালী ক্কসবাজারের মূল ভুখন্ড হতে আলাদা করে দিয়েছে। কোহেলিয়া নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫কিলোমিটার ।

বাঁকখালী নদী ঃ বাংলাদেশ মায়ারমার সীমান্তের ওয়াদিং পাহাড় থেকে উৎপান্ন হয়ে পার্বত্য নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার উপর দিয়ে রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে ককসবজার উপজেলার ঝিলংজা রামু উপজেলার মিটাছড়ি ইউনিয়নকে বিভক্ত করে খুরুশকুল ও পৌসভার মধ্যখান দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মোহনায় গিয়ে পড়েছে। দৈর্ঘ্য ৩৫কিলোমিটার ।

রেজু ঃ বাংলাদেশ মায়ারমার সীমান্তের আরকান ও ওয়াদিং পাহাড় থেকে উৎপান্ন হয়ে পার্বত্য নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার উপর দিয়ে উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নে প্রবেশ করে এর পর রামু উপজেলার খুনিয়া ইউনিয়নের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে উখিয়া উপজেলার জালিয়া পালং ইউনিয়ন ও রামু উপজেলার খুনিয়া পালং ইউনিয়নকে বিভক্ত করে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। রেজু দৈর্ঘ্য ২০কিলোমিটার ।

নাফনদী ঃ মায়ারমার লুসাই ও ওয়াদিং পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে কক্সবজার জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে প্রবেশ করে সমগ্র টেকনাফ উপজেলার পূর্ব পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। নদী মায়ারমার এবং বাংলাদেশ সীমানা হিসাবে কাজ করে। নদী হতে উপকুলের মৎসজীবিরা মৎস আরোহন করে জীবিকা নিবার্হ করে। নদীর দুপাশে পাহাড়, ম্যানগ্রুপ ফরেষ্ট এবং প্যারাবন প্রাকৃতিক সুন্দর্য্য বৃদ্ধি করে মনোমুগ্ধকর দর্শনীয় স্থানের পরিনত করেছে। নাফ নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫কিলোমিটার ।

কুতুবদিয়া চ্যানেল ঃ কুতুবদিয়া চ্যানেলটি বঙ্গোপসারের হতে শুরু হয়ে আলী আকবর ডেইলের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করে বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী ও উত্তর ধূরং এর পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহীত হয়ে বাশঁখালীর উপজেলার পশ্চিমে আবার বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই চ্যানেলটি দ্বীপটিকে মূল ভুখন্ড হতে আলাদা করে দিয়েছে। চ্যানেলটি হতে উপকুলীয় দু'উপজেলার মৎসজীবিরা জীবিকা নির্বাহ করে ।

পুকুর ঃ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ককসবজার সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফসহ ,মোট ৮টি উপজেলায় ছোট বড় সর্বমোট ১৩,৯৩০টি পুকুর আছে। উক্ত পুকুরের আয়তন ৪,৬৯৯.৯৪ একর। জেলার জনসাধারণ দৈনন্দিন ও সাধারণ কাজে পুকুরগুলো পানি ব্যবহার করে থাকে। তেলাপিয়া, কই, মাগুর, রুই, কাতলা, কার্পু, সরপুটি জাতীয় মাছের চাষ করা হয় এবং মিটা পানির মৎস চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপজেলার মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। সর্বপরি পুকুরে মাছ চাষ করে মৎসজীবিরা জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভুমিকা রাখছে। উক্ত পুকুরের পানি চাষাবাদ কাজে ব্যবহার করা হয় ।

খাল ঃ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ককসবজার সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফসহ, মোট ৮টি উপজেলায় ছোট বড় সর্বমোট ১১৫টি খাল আছে। উক্ত খালের আয়তন ৭,৭৭০.৬২ একর ।

উখিয়া উপজেলা : উখিয়া উপজেলায় ১৪টি খাল আছে ।
রেজুখাল: রেজুখালের ব্রীজের মুখ হতে পূর্ব পাইন্যাশিয়া পর্যন্ত। ছোট ছোট পাহাড়ি ঝর্না থেকে এই খালের উৎপত্তি হয়ে বঙ্গাপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এই খাল হতে জেলেরা মাছ আহরন করে জীবন - জীবিকা পরিচালীত করে। তাছাড়া শীত মৌষমে চাষাবাদের

জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এবং খালের দুই পাড়ে উচুও শক্ত বাঁধ না থাকার কারনে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা বিশেষ করে পাইন্যাশিয়া, সোনাইছড়ি, সোনাপাড়া, পাইন্যাষিশয়া, চরপাড়া, জুম্মাপাড়া এবং লম্বরীপাড়া বন্যা পালাবিত হয়। সামাদ্রিক জোয়ারের এর ফলে পানিতে লবনাক্ততা বেড়ে যায় ও ফসলের ক্ষতি করে । দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ কি:মি

মনখালী খাল: মনখালী সমুদ্রের খালের মুখ হতে মনখালী নতুন চাকমা পাড়া পর্যন্ত ।শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে থাকে চাষীরা| দৈর্ঘ্য প্রায়। ৮কি:মি: **চোয়াংখালী খালঃ** ৫ কি:মি প্রায়। চোয়াংখালী হতে শুরু হয়ে চোয়াংখালীর পূর্ব দিকে আকাঁ-বাকা হয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করেছে। শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে চাষীরা।(৮ নং ওয়ার্ড) । **ছেপটখালী খাল:** ১০ কি:মি প্রায় । মাদারবনিয়া হতে মনখালী দিয়ে ছেপটখালী পর্যন্ত, এই খাল হতে জেলেরা মাছ আহরন করে জীবন - জীবিকা পরিচালিত করে ।তাছাড়া শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিও পাহাড়ি ঢলের কারণে এবং খালের দুই পাড়ে উচুও শক্ত বাঁধ না থাকার কারনে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা মানুষ ক্ষতি গ্রস্থ হয়।(৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড) । **ইনানী বড় খাল: ১৫** কি:মি প্রায়। ইনানী খাল ছেয়ংচুলী হতে ইনানী পর্যন্ত । শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে থাকে । **ইনানী ছোট খাল: ২০** কি:মি প্রায়। ইনানী খাল ছেয়ংচুলী হতে ইনানী পর্যন্ত । শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে(৬,৭ ও ৮) | **চেইংচুরী খাল:** ভালকিয়া হতে পোষ্ট অফিস সড়ক পর্যন্ত ৬ কি;মি । বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এবং খালের দুই পাড়ে উচু ও শক্ত বাঁধ না থাকার কারনে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা পালাবিত হয়। শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে। **পাগলির খাল:** গুরাইয়ার দ্বীপ হতে ৪ নং ওয়ার্ডের পাতাবাড়ি পর্যন্ত ৮কি:মি প্রায় (হলদিয়া ইউনেয়নের ১,২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড) । **দুছড়ি খাল :** ১৫কি:মি তুতুরবিল হতে মধুরঘোনা পর্যন্ত । দুছড়ি খালের কারণে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা পালাবিত হয় । শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে। **গয়ালমারা খাল:** ১৮কি:মি: তুতুরবিল হতে মধুরঘোনা দিয়ে রত্নাপালং ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে ।বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এবং খালের দুই পাড়ে উচু ও শক্ত বাঁধ না থাকার কারনে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা পালাবিত হয় । **বালুখালী খাল:** ৭কি:মি প্রায়। মধুর ছড়া হয়ে চন্দ্রপাড়া দিয়ে নাফ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এবং খালের দুই পাড়ে উচু ও শক্ত বাঁধ না থাকার কারনে ইউনিয়নের বেশি ভাগ এলাকা পালাবিত হয় । সামাদ্রিক জোয়ারের এর ফলে পানিতে লবনাক্ততা বেড়ে যায় ও ফসলের ক্ষতি করে। **থাইংখালী খাল:** ৮কি:মি প্রায়। । আছড়তলীর ঘাটের দুই মুখা হতে তরুলাপাড়া ও ফাসিয়াখালী পাড়ার মধ্যে দিয়ে নাফ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে । **পালংখালী খাল**: ১৪ কি:মি প্রায়। নজুমোরা পূর্ব দিক হতে শুরু করে পালংখালী হয়ে সমিতি পাড়ার দক্ষিণে এবং টেকনাফ সীমান্তের উলুবনিয়া উ: পাশ দিয়ে নাফ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। **বালুখালী খাল:** ৬কি:মি প্রায়। মধুর ছড়ার দক্ষিণ পাশ হতে শুরু হয়ে বিজিবি ক্যাম্পের দক্ষিণে চৌধুরী পেরা ও বড়ুয়া পেরা মাঝখান দিয়ে নাফ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই খাল হতে পানি আহরন করে মৎস চাষ করে থাকে । শীত মৌষমে চাষাবাদের জন্য খালে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ ব্যবস্থা করে তাকে।

চকরিয়া উপজেলা ঃ চকরিয়া উপজেলায় ৩৪টি খাল আছে । টেকনাফ **উপজেলা ঃ টেকনাফ** উপজেলায় **১১**টি খাল আছে । **পেকুয়া উপজেলা ঃ** চকরিয়া উপজেলায় **১৮**টি খাল আছে ।

কুতুবদিয়া উপজেলাঃ

কুতুবদিয়া উপজেলায় **১২**টি খাল আছে । উত্তর ধূরং ইউনিয়নে ৭টি । **শেয়ার আলী বা জোয়ারখালী খাল, ধুরংখাল, কুইল্যাপাড়াখাল, বাইঙ্গাকাটা খাল, চন্দইন্যাখাল, তেলিয়াকাটা খাল, সতর উদ্দীনখাল :** এই সব খাল ৬কি:মি: দৈর্ঘ্য পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের আকবরবলীর সুইচ গেইট থেকে শুরু হয়ে ইউনিয়নের উত্তর, দক্ষিন, পুর্ব ও পশ্চিমে ঘোরে ফিরে পশ্চিমে বঙ্গোপসারের বেঁড়ীবাধে গিয়ে শেষ হয় । **খালগুলো দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ ও মৎস্য চাষে এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতি হয় ।

দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নে ১টি । **রাজাখালী খাল : ১** টি প্রায় ৫ কি.মি. কৈয়ার বিলের মলমচর হতে শুরু জেলেপাড়া, মুছাপাড়া, ধুরং বাজারে পূর্ব সীমান্ত হয়ে উত্তর ধূরং এ প্রবেশ করেছে । **খাল দ্বারা উপকার ও অপকার :** মুলত লবন চাষ , মৎস্য ও কৃষি কাজে এই খালের পানি ব্যবহার হয় , বর্ষা মৌসুমে খালের পানি পবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে । লেমশীখালী ইউনিয়নে ২টি । মিরাখালী খাল : ৮কি.মি. পিলটকাটা হতে মিরাখালী পর্যন্ত গাইনারজুরা খাল : ৩কি.মি. পিলটকাটা হতে গাইনাকাটা পর্যন্ত **খালগুলোর উপকার ওা অপকার :** মুলত লবন চাষ, মৎস্য চাষের কাজ এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকা পেয়ারাকাটা, জাইল্যাপাড়া, ধুপীপাড়া, আশাহাজীরপাড়া, করালাপাড়া, এ হকপাড়া, আকবরআলীপাড়া, আনুমিয়াজিরপাড়ায় ডুকে পড়ে জলাবদ্ধাতার সৃষ্টি করে ।

কৈয়রবিল ইউনিয়নে-১টি । **পিলটকাটা**-ডিঙ্গাভাঙ্গা **খাল : প্রায় ৬ কি.মি.** ডিঙ্গাভাঙ্গা হতে মিয়ারবাড়ী বেড়িবাঁধ পযর্ন্ত । **খালটির দ্বারা উপকার ও অপকার :** মুলত লবন চাষ, মৎস্য ও কৃষি কাজে এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে । বড়ঘোপ ইউনিয়নে ২টি । **মুরালিয়া খাল : ৩**কি:মি: পুর্বদিকে

কুতুবদিয়া চ্যানেলের জেলেপাড়া হতে শুরু হয়ে পশ্চিমে সৈরগ্যারপাড়া হয়ে বড়ঘোপ ইউনিয়নে প্রবেশ করে রুমাই পাড়ায় শেষ হয়। **আজমকলোনী খাল :** ৪কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের কলেজড্রাম হতে শুরু হয়ে মুখবন্ধা হয়ে কৈয়ারবিলের ঘিলাছড়ি আজম রোড়ে শেষ হয়। মুলত লবন চাষ ও মৎস্য চাষ এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের আমজাখালী, মগডেইল, মুরালিয়া, ঘোনার মোর, রুমাইপাড়া, মাতব্বরপাড়া ও চাঁদমিয়া এলাকা ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতিহয়। **আলী আকবর ডেইল-১টি কুমিরাচরা খাল :** ৬কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের কুমিরাচরা হতে শুরু হয়ে উত্তর-পশ্চিমে সৈরগ্যারপাড়া হয়ে বড়ঘোপ ইউনিয়নে প্রবেশ করে রুমাই পাড়ায় শেষ হয়। **রাজাখালী খাল :** ৪কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের খুদিয়ারটেক হতে শুরু হয়ে তাবালের চরের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে, তাবালেরচর-আলী আকবরডেইল সংলগ্ন আজম রোড়ে শেষ হয়। মুলত লবন চাষ ও মৎস্য এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের এলাকা ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতিহয়।

রামু উপজেলা ঃ

রামু উপজেলার মধ্য বা পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালের সংখ্যা ২৮টি। ইউনিয়নভিত্তিক খালের তথ্য তুলে ধরা হলো: **ঈদগড় ইউনিয়ন ঃ ১. রেনুর ছড়া খাল:**রেনুর ছড়া খালটি ৬নং ওয়ার্ডের নয়াপাড়া হতে ১নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়া হয়ে ঈদগড় ইদগাঁও নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। **২. চেংছড়ি খাল:**চেংছড়ি খালটি চেংছড়ি হয়ে আলীচং খালে গিয়ে মিলিত হয়েছে। **৩. চিকনির ছড়ার খাল:**চিকনির ছড়ার খালটি ৭নং ওয়ার্ডের খুড়াবিল হয়ে রেনুকুলে রেনুছড়ার খালে গিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন ঃ ১.মনিরঝিল সোনাইছড়ি খাল:মনিরঝিল সোনাইছড়ি খাল হতে ১-৭নং ওয়ার্ডে দরগামুরা পাড়ায় গিয়ে বাকখালী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে। **২. উখিয়ারঘোনা খাল:**বড়জুম ছড়া উখিয়ারঘোনা খাল ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হতে ফরেষ্ট অফিসের সামনে বাকখালী নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **৩. জারুলিয়াছড়ি খাল:** খালটি নাইক্ষ্যংছড়ি খাল হয়ে মইশকুম ব্রীজের পাশের বাকখালী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে। **খুনিয়াপালং ইউনিয়ন ঃ ১.ধোয়াপালং খাল:** খালটি আর্মি ক্যাম্প থেকে তুলাবাগান দিয়ে ২নং ওয়ার্ডে এসে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **২. ধুইল্যাছড়ি খাল:** ধুইল্যাছড়ি খাল ৪, ৫, ১নং ওয়ার্ডে দারিয়ারদিঘী থোয়েংগাকাটা হয়ে ৩ - ৬নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে, **৩. রেজুর খাল:** ৮নং ওয়ার্ড থেকে ৯নং ওয়ার্ড মাংগালা পাড়া হয়ে ধেচুয়াপালং দারিয়ারদিঘী ১, ৪, ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে মিলিতি হয়েছে। **৪. কালারপাড়া খাল:** কালারপাড়া খালটি আর্মি ক্যাম্প থেকে তুলাবাগান দিকে ২নং ওয়ার্ডে এসে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন ঃ ১.** সোনাইছড়ি খাল: বাইশারী হতে ৩, ৪ ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে গিয়ে চৌফলদন্ডী মাথায় এসে সোনাইছড়ি খালে এসে মিলিত হয়েছে।

কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন ঃ ১. বড় জাংছড়ি খাল: এই খালটি ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হয়ে বাকখালী নদীতে এসে সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে। **২. ছোট জাংছড়ি খাল:** এটি ৪ ও ৭নং ওয়ার্ডের বার্মা সীমানা হয়ে বাকখালী নদীতে মিলিত হয়েছে। **৩. নাইক্ষ্যংছড়ি খাল:** এই খালটি ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হয়ে বাকখালী নদীতে এসে সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে। **দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন ঃ ১. বাকখালী ও ২. নতুন কাটা খাল:** খাল ২টি ৯নং ওয়ার্ডের পশ্চিম দিকের শেষ মাথায় মনতিরমার সাকুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। **গর্জনিয়া ইউনিয়ন ঃ ১. থিমছড়ি খাল:**থিমছড়ি খালটি হিলট্রেক্স থেকে এসে ৩, ৪ ও ২নং ওয়ার্ডে গর্জনিয়া খালের মুখে এসে পড়েছে। **২. গর্জনিয়া খাল:**গর্জনিয়া খালটি বাইশারী হয়ে ১, ২, ৩, ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে ছোট গর্জই খালে মিশেছে।**৩. বড় গর্জই ও ৪. ছোট গর্জই খাল:**খাল ২টি ঈদগড় বাইশারী হয়ে ঘুরে গিয়ে নতুন বাজার-শিয়াপাড়া হয়ে ১, ২, ৩, ৫, ৮নং ওয়ার্ডে এসে গর্জনিয়া খালের সাথে মিলিত হয়ে বাকখালী নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **রাজারকুল ইউনিয়ন ঃ দক্ষিণ কাটাখালী খাল:** এই খালটি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড হয়ে দক্ষিণ মিঠাছড়ি দিয়ে বাকখালী নদীতে গিয়ে পড়েছে। **চাকমারকুল ইউনিয়ন ঃ ১. পাতলী খাল:** পাতলী খালটি গুইল্যাছড়ি হতে মনতারগুদা পিএমখালী বাংলাবাজার হয়ে বাকখালী নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। ২. **ফারিরখাল:** ফারির খাল ৬, ৭, ৮নং ওয়ার্ড পূর্ব মোহাম্মদপুরা থেকে শ্রীমুরা হয়ে চৌফলদন্ডী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মিলিত হয়েছে। **৩. বাকখালী খাল:** বাকখালী খালটি ১, ২, ৩ ও ৯নং ওয়ার্ড মিস্ত্রি পাড়া থেকে শুরু করে পশ্চিম চাকমারকুল হয়ে বঙ্গোপসাগরের এসে প্রবাহিত হয়েছে। **রশিদনগর ইউনিয়ন ঃ পানির ছড়া খাল:** এই খালটি রামাইত্যা নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে। ২. **থলিয়ারঘোনা খাল:** খালটি ৬নং ওয়ার্ড থেকে ৩-৭নং ওয়ার্ড পানির ছড়া খালের এসে মিলিত হয়েছে। ৩. **উল্টাখালী খাল** ৯নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে। **৪. বড় ধলীরছড়া খাল:** ৩নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে। **৫. মাছেয়াখালী খাল: ১**নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে। রামু উপজেলায় **ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নে কোন খাল নাই।**

বিল ঃ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ককসবজার সদর, রামু উখিয়া, টেকনাফসহ ,মোট ৮টি উপজেলায় ছোট বড় সর্বমোট ৬২৯টি বিল আছে। কুতুবদিয়া উপজেলা ঃ কুতুবদিয়া উপজেলা ছোট বড় ৪৯টি বিল দেখা যায়। **উত্তর ধরং ১৩টি** ১. কালামাছরা বিল, ২. ফুলারপাড়া-সিকদারপাড়া বিল, ৩. কালামাপাড়া বিল, ৪. পিল্লারপাড়া বিল, ৫. আজিমউদ্দীন সিকদারপাড়-চুল্লারপাড়া বিল, ৬. জমির বাপেরপাড়া বিল, ৭. মনু সিকদারপাড়া বিল, ৮. নয়াকাটা-চইন্দার বিল, ৯. পূর্ব চরধূরং বিল, ১০. মগলারপাড়া-আজিমউদ্দীন সিকদারপাড়া বিল, ১১. সিরাজ্জারপাড়া, ১২. কুলারটেক ও ১৩. মিয়াজিরপাড়া-নুরজ্জালপাড়া বিল এসব বিলে

ধান চাষাবাদ ও লবন চাষ হয় এবং বর্ষার সময় কিছু মৎস চাষ হয়, **দক্ষিন ধুরং ১২টি ১**.মশরফ আলী মিয়া বিল, ২.কালু মিয়াজিরপাড়া বিল, ৩.আলী আকবর সিকদারবিল, ৪.জলিয়ারবর বিল, ৫.সিকদারপাড়া বৈদ্যয়ারবিল, ৬.বরইতলীপাড়া বিল, ৭.হায়দারআলী মিয়াজিরপাড়া বিল, ৮.ধুরং কাচা বিল, ৯. ইুরারপাড়া বিল, ১০.আলী ফকির বিল, ১১.মুছারপাড়া বিল, ১২. ডোমপাড়া বিল, **লেমশা খালী ৩টি ১**.দোকান ঘোনা বিল, ২. লাইত্যার ছড়া, ৩. সিরাজ ঘোনা বিল এসব বিলে চাষাবাদ করা হয়, কৈয়ারবিল-**১১**টি ঘিলাছড়ি বিলা, মলমচর বিল, দঃ মলমচর বিল, অমন্যঘোনাবিল, কৈলাশ্যঘোনাবিল, খিল্যাপাড়াবিল, মধ্যম কৈয়ারবিল, মহাজনপাড়া বিল, বিন্দাপাড়া বিল, উত্তর কৈয়ারবিল ও কিল্যাপাড়াবিল, **বড়ঘোপ ৬টি ১.** মগডেইলের পূর্ব বিল(কৃষি চাষ), ২. মগডেইলের পশ্চিম বিল(কৃষি চাষ) ৩. মুরালিয়া বিল(লবন চাষ), ৪. মিয়ারঘোনা ৫. আজমকলোনী বিল(লবন চাষ), ৬. ধোপার ঘোনা(কৃষি চাষ), **আলী আকবর ডেইল ৪টি, ১.**আলী আকবর ডেইল উত্তর বিল, ২. আলী আকবর ডেইল দক্ষিণ বিল, ৩. কুমিরাচরা বিল ও ৪. রাজাখালী - খুদিয়ারটেক বিল ।

উখিয়া উপজেলা ঃ ১৬টি রত্নাপালং ইউনিয়ন-৩ টি কামরীয়ার বিল, ভালুকিয়া বিল ও খুয়া বিল, হলদিয়াপালং ইউনিয়ন-৪ টি, উত্তর বড়বিল, পাতাবাড়ি বিল,চৌং বিল,পাগলির বিল, রাজাপালং ইউনিয়ন-৫ টি খইরাতির উত্তর বিল,মাছকারিয়া, সিকদার পাড়া বিল, প: দরগার বিল, পূর্ব দরগার বিল, পালংখালী ইউনিয়ন-৪ টি, রহমতের বিল,আঞ্জুমান পাড়া, দক্ষিণ রহমতের বিল ।

রামু উপজেলা ঃ উপজেলায় মোট বিলের সংখ্যা ঃ ১৬২টি । এর মধ্যে ২৭টি ঈদগড়, ১৩টি খুনিয়াপালং, ৪৭টি কচ্ছপিয়া, ৩০টি দ: মিঠাছড়ি, ৩টি গর্জনিয়া, ২টি রাজারকুল ও ৪০টি চাকমারকুল ইউনিয়নে । ব্যবহার ও উপকারীতা ধান এবং সবজির চাষ হয় ।

চকরিয়া উপজেলা ঃ ২১৭টি , পেকুয়া উপজেলা ঃ ৮৯টি, টেকনাফ উপজেলা ঃ ৬৮টি , মহেশখালী উপজেলা ঃ ২৮টি ।

জেলার বিভিন্ন বিল হতে নানা ধরণের বিশেষ করে দেশীয় মাছ আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে । মাছের চাহিদা ও পুষ্টি পূরণে অবদান রাখছে । এই বিলগুলোতে ধান, লবনসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমে কৃষিজ শষ্য উৎপাদনে সাহায্য করে ।

জেলায় কোন হাওড় ঃ নাই ।

লবনাক্ততা ঃ সাগর তীরবর্তী জেলা হওয়ায় কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর ও টেকনাফ উপজেলায় লবনাক্ততা রয়েছে ।

আর্সেনিক দুষণ ঃ জেলায় এই যাবৎ কোন আর্সেনিক দুষণ চিহ্নিত হয়নি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং

২.১. দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

কক্সবাজার জেলার অধিকাংশ এলাকা নদী ও পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী হওয়ায়, প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলে আঘাতহানে। ফলে এ জেলার অধিবাসীরা সামগ্রীকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। বিরাজমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাস, পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লবনাক্ততা, ভুমি বা পাহাড় ধস, উপকুল ভাঙ্গন, পাহাড় নিধন, কালবৈশাখী/বজ্রপাত, বন্য প্রাণীর আক্রমন, ভুমিকম্প, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে এতদাঞ্চলের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির মধ্যে থাকে। সেই বিবেচনায় অত্র জেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাস, পাহাড়ী ঢলে আকস্মিক বন্যা, জলাবদ্ধতা, উপকুল ভাঙ্গন, বন্য হাতির আক্রমন, পাহাড় কাটা, প্যারাবন বা বৃক্ষ নিধন, কালবৈশাখী, বজ্রপাত, অতি বৃষ্টি উল্লেখ্যযোগ্য।

১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ, চকরিয়া, পেকুয়া, উখিয়া, কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলায় ব্যাপক জলোচ্ছাস হয়েছিল। জেলার সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, মাতারবাড়ী-ধলঘাটা দ্বীপ ও উপকুলীয় উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসে ও ২০-৩০ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছাস আছড়ে পড়ে এবং সেই সময় প্রায় ৭২ ঘন্টার জোয়ারের পানি স্থায়ী ছিল। ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সালের জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল বাতাসে গাছপালা, পাহাড়ী বন সম্পদ বা বন, লবন সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় যা পুরণ করার মত নয়। জেলার ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড় সাধারণতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক আসে এবং জলোচ্ছাসও সেই একই দিক থেকে ধেয়ে আসে।

সাধারণত বর্ষা মৌসমের সামুদ্রিক জোয়ার ৩-৫ ফুট উচ্চতায় প্লাবিত হয়ে থাকে এবং ৫-৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জেলার মোট ৬টি উপজেলায় পাহাড় বেষ্টিত ও উচু ভূমি থাকার কারণে দ্রুত পানি নেমে যায়। বিশেষভাবে বছরেরর মার্চ-মে এবং অক্টোবর মাসে এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা, নদী, খাল বা উপকুল ভাঙ্গন, হাতির আক্রমন, পাহাড় কাটা, প্যারাবন, ঝাউবন, বা বৃক্ষ নিধন এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। নিম্নে জেলার দুর্যোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো ঃ

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়
বন্যা	২০১০	• ক্ষতিগ্রস্থ ৫টি উপজেলার ইউনিয়ন ২৯টি • ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ২২৫.৫বর্গকি.মি. • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার - বেশী ৪৮১৭টি আংশিক - ১০,৬২৫টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক - ১১,৫৪৫জন, আংশিক ৪৮,৬৯৫জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৫১জন • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - ৫১টি • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা - ১৮৮টি • হাঁসমুরগী- ৫৯৬৫টি • ১০০১ একর ফসল ক্ষতি হয় • ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপ - ৩৭১টি • পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত - ৩৮টি • চিংড়ি/মৎস খামার/হ্যাচারি খাতে ৪,৬৪৩একর জমিসহ প্রায় ১৯.২৬ কোটি টাকা • ২৮১টি নলকুপ, জলাশয় রাস্তাঘাট ও অন্যান্য খাতেসহ মোট ক্ষতি হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা।	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পানের বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী, আবাসিক, বনভুমি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি
ঘুর্ণিঝড় "বিজলি"	২০০৯	• ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা ৫টি	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়
		• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৩,০৮০টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৭৭,৫০০জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৩ জন • ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ -৭কিমি. • ফসল ক্ষতি হয় ৩,৭১৬.৪ একর • ক্ষতিগ্রস্ত লবন ২৫৫২ একর	জমি, ধান, পানের বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী, আবাসিক, বনভুমি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি
ঘুর্ণিঝড় "আইলা"	২০০৯	• ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলার ইউনিয়ন ২৬টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৫,৬২৪টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ২৯,১৬৫জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ২ জন • ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা - ৫৪.৪কিমি. • ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ -৩৭.৭৬কিমি. • ১৫০০০ একর জমির ১৫% ফসল ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ২ কোটি টাকা । • চিংড়ি/মৎস/হ্যাচারি খাতে ৫০০০ একর জমিসহ প্রায় ৩ কোটি টাকা	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পানের বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী, আবাসিক, বনভুমি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি
ঘুর্ণিঝড়	১৯ মে ১৯৯৭	• ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা ৮টি, • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ২,১৯,৯৫৬টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১১,৩২,১৭৪জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৩৪জন (আহত-৩,৫১৬জন) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা - ৩,২০০ • শর্য্য ক্ষতির পরিমান - ২৯,৭২৬ একর • গাছপালা - ১,৩৩,৬৯৯টি • ব্রীজ/সেতু - ২৬৩টি • কালভার্ট - ৩১টি • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - ২৪৪ টি • বাধঁ ক্ষতিগ্রস্ত - ৬৬কি.মি. • রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত - ২১৮ কি.মি. • টেলিযোগাযোগ খাতে ১৫ কোটি টাকা • চিংড়ি/মৎস খামার/হ্যাচারি খাতে ২৪০০একর জমিসহ প্রায় ৭ কোটি টাকা • নলকুপ, বনভুমি, রাস্তাঘাটসহ গাছপালা ক্ষতি হয়, পানবরজ, সুপারীবাগান, ঘরবাড়ী সহ ব্যাপক ক্ষতি হয় । যার মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা ।	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পানের বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী, আবাসিক, বনভুমি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি
ঘুর্ণিঝড়	২০০৭	• ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি উপজেলা ৪৩টি ইউনিয়ন, • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা - ১২০কিমি. • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ২,০০৪টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৮,৫৫জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৭জন (আহত-৩,৫১৬জন) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা - ৩টি • শর্য্য ক্ষতির পরিমান - ১২৭৬.০৫ একর • শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান - ১১ টি • বাধঁ ক্ষতিগ্রস্ত - ২৯.৪০কি.মি.	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ , গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, পান বরজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর, পর্যটন, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বনভুমি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়
		• রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত - ২১.৫ কি.মি.	
ঘুর্ণিঝড়	১৯৯৪	• ক্ষতিগ্রস্থ ৮টি উপজেলার ইউনিয়ন ৬৪টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৭৪,২২৯টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৩,৯০,৬১৫জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ১২৭জন • রাস্তা - সড়ক ও জনপথ ৭৯কিমি(১.৭১কোটি টাকা) • রাস্তা- এলজিইটি : ৯০কিমি. ব্রীজ/কালভার্ট-৮৩টি (১.৩৪ কোটি টাকা) • বাঁধ - ৯৭কিমি. (৪.০৩৯৬কোটি টাকা) গাছপালা - ২৫,১৭,৩০৫টি (২০কোটি টাকা) • বিদ্যুৎ খাতে ২০.৬৫কোটি টাকা • ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান - ৫৪৪টি (১.২২কোটি টাকা) • ফসলের ক্ষতি - ৭৬,২১৪ একর (৫০.৮৫কোটি টাকা) • শিল্প খাতে ৩০ লক্ষ টাকা • টেলিযোগাযোগ খাতে ১ কোটি টাকা • বোট / নৌকা - ১৫২ টি • পান বরজ ৩২৮৭ একর (১.৬৫ কোটি টাকা) • চিংড়ি জমি - ২৫৩০একর (প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা) • লবন জমি - ১৯৯৬ একর (২০লক্ষ টাকা) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা-১১৯৬ পাখি ৯১৫৪টি এ খাতে ক্ষতির পরিমান ৬০ লক্ষটাকা • ১৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মূল্য ৪.৪৫ কোটি টাকা • নলকুপ, বনভুমি, পর্যটন, জেটিঘাটসহ অন্যান্য খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয় । (ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি পরিমান ৫২৫কোটি ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা)	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ , গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর, বনভুমি, ঘরবাড়ী, পর্যটন, বিদ্যুৎ. টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি
ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	১৯৯১	• ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ৮টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১,৯৬,৪১৭টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১১,২১,৬৮৯জন • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ১৩৩৯ বর্গকি.মি. • মৃত্যুর সংখ্যা ৪০,০২২৪ জন আহত ১,১৯,৫০০ জন • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা- ২,১০,১১৪টি • ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি -২৬,৩৪৯একর • ক্ষতিগ্রস্ত - লবন জমি - ৪৯,৯৭০একর • ক্ষতিগ্রস্ত - চিংড়ি জমি - ৩৯,২৭৫একর • ক্ষতি বাঁধ - ১০৯৯কি.মি • ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা - ১০০৩ কি.মি. • বনজসম্পদ/গাছপালার সংখ্যা ১৬,২৯,০০০টি • ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠন ৮৬৫টি • ১১,৯৪১ একর পানবরজ ক্ষতি হয় • ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্ট - ১৩৫টি	মানব সম্পদ, অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ , গবাদি পশু, ফসলিজমি, লবন, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর, বনভুমি, বনসম্পদ, ঘরবাড়ী, টেলিযোগাযো, পর্যটন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়
		• ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার সংখ্যা-৩৫০০টি • বিদ্যুত খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ১০.৯৬ কোটি টাকা • টলিযোগাযোগ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩১কোটি টাকা • শিল্প খাতে ক্ষতিগ্রস্ত - ১৬৫ কোটি টাকা • মোট সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ -২০০২.১ কোটি টাকা (ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি পরিমান ২০০২.১০কোটি টাকা)	

২.২ কক্সবাজার জেলার আপদ সমুহ ঃ

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
০১.	ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	০১.	ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস
০২.	পাহাড়ী ঢল/আকস্মিক বন্যা	০২.	উপকুল ভাঙ্গন
০৩.	লবনাক্ততা	০৩.	জলাবদ্ধতা
০৪.	কালবৈশাখী / বজ্রপাত	০৪.	লবনাক্ততা
০৫.	জলাবদ্ধতা	**০৫.**	পাহাড়ী ঢল/আকস্মিক বন্যা
০৬.	বন্য হাতির আক্রমন	**০৬.**	কালবৈশাখী / বজ্রপাত
০৭.	উপকুল ভাঙ্গন	**০৭.**	ভুমিকম্প
০৮.	ভুমিকম্প	**০৮**	বন্য হাতির আক্রমন

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্র বিস্তারিত বর্ণনাঃ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসঃ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ককসবাজার জেলার উপকুলবর্তী অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আপদ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় এখনো স্থানীয় অধিবাসিদের কাছে একটি বিভীষিকাময় স্মরণীয় অধ্যায়। স্বজন হারানোর বেদনা এখনো তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ঐ ঝড়ে প্রতি ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২০-২২৫কিঃমিঃ এবং ২০-৩০ফুট উচু জলোচ্ছাস সংগঠিত হয়। গত দশকে ১৯৯১ এর ২৯ এপ্রিল, ১৯৯৪ এর ২রা মে, ১৯৯৫ সালের ১৫ মে, ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ও ১৯৯৮ সালে ২০মে, ২০০১ সালের, ২০০৪ সালের ১৫ মে ও ২০০৭ সনের ১৪ মে জেলার ৮টি উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এতে বহু পরিবার তাদের আত্বীয়-স্বজন হারিয়েছেন, অনেকে বেঁচে থাকার সম্বল হারিয়েছেন। সাইক্লোনের প্রচন্ড গতির টানে বিরাট জলরাশিসহ সমুদ্র উপকুলীয় উপজেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালী, চকরিয়া, পেকুয়া ও টেকনাফসহ ৮টি উপজেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ জলোচ্ছাসে ৩ ফুট থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল। (সূত্র পিআইও দপ্তর, সিপিপি তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষাৎকার)। অনুরূপ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সংঘটিত হলে এলাকার অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা মারাত্বকভাবে ব্যাহত হবে। ধবংস হবে অবকাঠামো, মানব সম্পদ, অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ , গবাদি পশু, ফসলিজমি, লবন, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর, বনভুমি, বনসম্পদ, ঘরবাড়ী, টেলিযোগাযো, পর্যটন, বিদ্যুৎ সররাহের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো।

পাহাড়ী ঢল/আকস্মিক বন্যা ঃ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া, ককসবাজার সদর, রামু, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা সমূহ পাহাড় বেষ্টিত হওয়ায় অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ী ঢলের ফলে আকস্মিক বন্যা সংগঠিত হয়। পাহাড় থেকে সৃষ্ট জেলার সংখ্য খাল, ছড়া ও মাতামুহুরী, বাঁকখালী, রেজু, কোহেলিয়া, নাফনদীর প্রবহিত এলাকা, নিম্ন ও সমভূমি অঞ্চল প্লাবিত করে। পাহাড়ী বন্যায় ধান, সব্জী, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো এবং বাধঁ এর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে। পাড়াহী ঢল সৃষ্ট হলে উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, রামু উপজেলার অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে অবকাঠামো, স্থানীয় সম্পদ, রাস্তাঘাট, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, পান বরজ, বনসম্পদ, ঘরবাড়ী ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপকুল ভাঙনঃ জেলার উপকুলীয় কুতুবদিয়া উপজেলা (আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, উত্তরধুরং), মহেশখালী(ধলঘাট, মতারবাড়ী, কলারমারছড়া, শাপলাপুর, কুতুবজুম, সোনাদিয়া), চকরিয়ার নিম্ন অঞ্চল, পেকুয়ার মগনামা, ককসবাজারের বাকখালী নদীর মোহনা, টেকনাপের নিম্নাঞ্চল এলাকায় সমুদ্রের নিম্নচাপ, অমবশ্যা পূর্ণিমার জোয়ার এবং বর্ষার সময় ৪ থেকে ৮ ফুট পানি উঠে। স্বাভাবিক জোয়ারের কারনে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উপকুলীয় গ্রাম গুলোতে জোয়ারে পানি ঢুকে তলিয়ে যায়। ২০১২-১৩ সালে আষাঢ় মাসে কয়েকদিনের টানা প্রবল বর্ষনের কারনে উপজেলার বেড়ী বাধ গুলো ক্ষতি গ্রস্ত হয় সেই কারনে সমগ্র এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়ে ফসল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় অনুরূপ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সংঘটিত হলে এলাকার অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা মারাত্বকভাবে ব্যাহত হবে।

কালবৈশাখীঃ ককসবাজার জেলা বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নচার, লঘুচাপ কিংবা টর্ণেডোর/কালবৈশাখী ঝড়ো দমকা হাওয়া উপকুলীয় উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যায়। জেলার অধিকাংশ ইউনিয়নের জনগন গরীব হওয়ায় দূর্বল ঘরবাড়ী, অবকাঠামো ক্ষতিহয়। জলাবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামীতে অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়ে প্রবনতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। অপরিকল্পিত বসতভিটা কালবৈশাখী সহনীয় নয়, বড় আকারে কালবৈশাখী হলে বা আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

লবনাক্ততা-কক্সবাজার জেলায় লবনাক্ততা একটি আপদ। লবনাক্ততার মাদত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ মাস থেকে জৈষ্ট মাস পর্যন্ত লবনাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। বর্ষার সাথে সাথে লবনাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকঅয় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমূদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর পানের লবনাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা চিংড়ি চাষের জন্য এলাকায় লবনাক্ততা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত ভেড়ী-বাঁধ না থাকায় জলোচ্ছাসের সময় এলাকা প্লাবিত হয়ে লবনাক্ততা প্রবেশ ঘটছে। বিশেষভাবে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া টেকনাফ ও সদর উপজেলায় এর প্রভাব বেশী। এলাকায় দিন দিন লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বোরো ও আউস ধান চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে ফলদ, বনজ সম্পদ ও খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।প্রতি বছর লবনাক্তোতা থাকলেও ২০০৬ সালে তীব্র লবন অনুভুত হয়।

বন্য হাতির আক্রমণ ঃ কক্সবাজার জেলার রামু চকরিয়া ও উখিয়া উপজেলায় পাহাড়ী বনভুমি হাতি অভায়ারন্য হিসাবে নাম ছিল । এ পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক বন্য প্রাণী বাস করে এবং এ প্রাণীর আক্রমনে কৃষি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বিশেষ করে ফসল কাটার সময় বন্যহাতির আক্রমন হয়ে থাকে । হাতির আক্রমে অনেক ঘরবাড়ী ভাংচুরসহ মানুষ গবাদিপুশুর মৃত্যুও হুমকির কারণ হয়ে দাড়ায় ।

জলাবদ্ধতা ঃ জেলার অধিকাংশ উপজেলার ভুমি উঁচু ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার সৃষ্টি হয় না । তবে অতি বৃষ্টির কারলে পাহাড়ী ঢলে অনেক স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় । বাঁধ নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমে আসবে ।

ভুমিকম্প ঃ বাংলাদেশ এবং পার্শবতী অঞ্চল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এলাকাটি মাঝারী মাত্রার ঝুঁকিতে আছে । ভুমিকম্পের বিগত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে বৃহত্তম ভুমিকম্প হয় । ১৯৯৯সালে ২২ জুলাই জেলার মহেশখালীতে মাঝারী ভু-কম্পন হয় । এতে ৭জনের মৃত্যু ও ২০০জন আহত ও অসংখ্য ঘরবাড়ী ভেঙেগ পড়ে ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ঘূর্ণিঝড়া/ জলোচ্ছাস	● অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতি হয় ● চাষ যোগ্যজমির ক্ষতি হয় ● যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে । ● জেলার প্রায় সব উপজেলার নদী ও খাল প্লাবিত হবে । ● আবাসন ঘরবাড়ী নষ্ট হয় । ● ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হতে পারে । ● লবন মাঠের ব্যাপক ক্ষতি হয় ● প্যারাবন নষ্ট হয় । ● বেঁড়ীবাধের ভেঙ্গে যায় । ● অধিবাসীদের পেশা অপ্রত্যাসিত প্ররিবর্তন আসে ।	- সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় স্থানীয় পদ্বতিতে মাটিতে গর্ত করে ধান সংরক্ষণ করে ; - মেরিংড্রাইভ সড়ক আছে ; - উপকুলীয় উপজেলায় বেড়ীবাধ আছে ; - জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে উচু স্থান আছে ; - বসত বাড়ীর চারপাশে ঘূর্ণীঝড়ের প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে ; - আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মানের জন্য জমি আছে। - পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মান করার সুযোগ আছে - কক্সবাজার জেলার প্রতি উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে ।
পাহাড়ী ঢল/বন্যা	● বসতবাড়ীর ক্ষতি হয় । ● অবকাঠামোর নষ্ট হয় । ● যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে ● ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ● বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দেখা দেয় ● পানিবাহিত রোগ বেড়ে যায় ● মশা, মাছি উপদ্রব বেড়ে যায়	- পাহাড়ী এলাকা হওয়া বৃষ্টি কমে গেলে পানি নেমে যায় । - পাহাড়ী ছরা সংস্কার করা যেতে পারে । - উচু বাঁধ দিয়ে ফসলের জমি রক্ষা করা যেতে পারে । - কিছু কৃষক চাষ, মাছধরার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে; - ইউনিয়ন পরিষদ উদ্যোগে মাটি ভরাট কর্মসূচি করা যায় ।
কালবৈশাখী	● ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় । ● ঘরবাড়ী নষ্ট হয় । ● বসত বাড়ীর গাছপালা, পাহাড়ী বৃক্ষসহ বন সম্পদ নষ্ট হয়	- জেলার ৮টি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে ।
	● ঘরবাড়ী নষ্ট হয় ;	- কুতুবদিয়ায় আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, উত্তর ধূরং

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন	• ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ; • বেড়িবাধ ভেঙ্গে যায় ; • চিংড়ি মাছের ঘের পানিতে তলিয়ে যায় ; • ভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে ; • চাষ যোগ্যজমির ক্ষতি হয় ; • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে ; • ম্যানগ্রুপ ফরেস্ট ধব্ংস হচ্ছে ;	এলাকায় ৮.০৫ কিলোমিটার ব্লক দেয়া আছে এবং দ্বীপের ২০ কিলোমিটার বেড়িবাধ রয়েছে ; - মহেশখালী, টেকনাফ, পেকুয়া, চকরিয়ায় প্রসস্ত বেঁড়ীবাঁধ করার জায়গা আছে ; - উপকুলীয় এলাকায় স্লুইচ গেইট দেওয়ার জায়গা আছে ; - সমগ্র জেলায় বেড়িবাধেঁর পাশে বা উপর প্রায় ৩,০০০ একর জায়গায় ঝাউবন রয়েছে যা জোয়ার পানিকে কিছুটা সহনীয় করে রাখে । - ৮টি উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ২৫০টি স্লুইচ / রেগুলেটর আছে ।
জলাবদ্ধতা	• ফসলের ও ঘরবাড়ী নষ্ট হয় • বেড়িবাধ ভেঙ্গে যায় • যোগাযোগের ক্ষতি হয়	- অমাবশ্যা, পূর্নিমার সাভাবিক জোয়ের পানি উঠার আগে স্থানীয় জনগন পার্শবতী উচু গ্রামে চলে যায় - উচু জায়গায় আশ্রয় নেয় ।
বন্যহাতির আক্রমন	• ফসলের ক্ষতি হয় । • ঘরবাড়ী নষ্ট হয় ।	- উঁচু গাছে টং বেঁধে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা আছে ; - স্থানীয় লোকজন দলবদ্ধ হয়ে মশাল জ্বেলে হাতি তাড়ানো ;
লবনাক্ততা	• কৃষিজ ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত হয় । • সুপেয় পানির দুস্প্রাপ্যতা বেড়ে যায় । • মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় ।	- কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর ও টেকনাফে বেড়ীবাঁধ আছে । - স্লুইচ গেইটের ব্যবস্থা আছে ।
ভূমিকম্প	• বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে । • প্লাবিত হয়ে ঘরবাড়ী ও জনবসাতির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিতে পারে ।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘুর্নিঝড়/ জলোচ্ছাস	• কুতুবদিয়া উপজেলার ৬ ইউনিয়ন আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ও উত্তর ধুরং ইউনিয়ন সমূহ । • চকরিয়া উপজেলা বদরখালী, কোনাখালী, খুটাখালী, ডুলহাজারা, শাহারবিল, সুরাজপুর মানিকপুর, কাকারা, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা, কৈয়ারবিল, বরইতলী, হারবাং, পূর্ব বড় ভেওলা পশ্চিম বড় ভেওলা, ডেমুশিয়া, ফসিয়াখালী, বমু বিলছড়ি, পৌরসভা, চিরিংগা, লক্ষ্যরচর, কাকারা ; • পেকুয়া উপজেলায় পেকুয়া সদর, রাজাখালী, বারবাকিয়া, মগনামা, টইটং, উজানটিয়া, শিলখালী ইউনিয়ন সমূহ ; • মহেশখালী উপজেলার ধলঘাট, মাতারবাড়ী, কালারমারছড়া, হোয়ানক, বড় মহেশখালী, কুতুবজোম, মহেশখালী পৌরসভা, ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন সমূহ ; • রামু উপজেলার খুনিয়াপালং, মিটাছড়ি, ফতেখাঁরকুল, ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, াউয়ারখোপ, রাজারকূল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি,	• সঠিক সময়ে সর্তক সংকেত না পাওয়া • আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার অনিহা • দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয় • বঙ্গোপসাগরে তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় কারণে ।	সমগ্র জেলার ৪,১৫,৯৫৪ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, খুনিয়া পালং, চাকমারকূল ইউনিয়ন সমূহ । ● কক্সবাজার সদর উপজেলা ঝিলাংজা, পাতলী মাছুয়া খালী, খুরুশকুল, চৌপলদন্ডি, ভারুয়াখালী, পোকখালী, ঈদগাঁও, জালালবাদ, ইসলামাবাদ, ইসলামপুর ইউনিয়ন এবং কক্সবাজার পৌরসভা ; ● উখিয়া উপজেলার জালিয়া পালং ইউনিয়নের সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, লম্বরীপাড়া, সোনাইছড়ি, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদার শফির বিল, রুপপতি, বাইলাখালী, ঈমামের ডেইল, সেপটখালী, মাদারবনিয়া, ও মনখালী, পালং খালী ইউনিয়নের ফাড়িরবিল, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, বালুখালী, গয়ালমারা, ধামনখালী থাইংখালী, রহমতের বিল গ্রাম সমূহ । ● টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিনসহ সমগ্র উপজেলা ।		
পাহাড়ী ঢল/বন্যা	● জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়া পালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের রেজুর খাল নিকটবর্তী এলাকা ; ● কক্সবাজার সদর উপজেলা ও রামু উপজেলার বাঘখালী নদী এলাকাসহ, সদর উপজেলা খুরুশকুল, চৌফলদন্ডি, ভারুয়াখালী, ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, ঈদগাঁও, পিএমখালী, ঝিলংজা ও পৌরসভা এবং রামু সমগ্র ইউনিয়ন সমুহ ; ● মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক, কালারমারছড়া, শাপলাপুর, ছোট মহেশখালী ; চকরিয়া উপজেলার মাতামুহুরী নদীর নিকটবর্তী এলাকা সমূহ ও বদরখালী, ডেমুশিয়া, দরবেশখাটা, শাহারবিল, পশ্চিম বড় ভেওলা, সুরজপুর, মানিকপুর, চিরিংগা, পৌরসভা, লক্ষ্যরচর, ফাসিয়াখালী ; ● পেকুয়া উপজেলার কৈয়ারবিল, টেইটং, পেকুয়া সদর, উজানটিয়া, রাজাখালী, শীলখালী; ● টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা, হোয়াক্যং, বাহারছাড়া, সারবাং, টেকনাফ সদর ইউনিয়ন সমূহ;	● অতি বৃষ্টি ; ● পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা ; ● ভরাট হয়ে খালের গভীর কমে যাওয়া ; ● নদী/খাল দখল হয়ে স্থাপনা নির্মাণ ; ● অপরিকল্পিত রাস্তা তৈরী ; ● স্বাভাবিক মাটি ক্ষয় হয়ে যাওয়া ● রাস্তা নিচু হয়ে যাওয়া; ● খালের দু'পার বনায়ন না থাকা	প্রায় ৩,০০,০০০ পরিবার
কালবৈশাখী	সমগ্র জেলার ৮টি উপজেলা সমূহ	● আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন ● সকর্তার সুযোগ না দেয়া ; ● দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা	সমগ্র জেলার জনগণ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
জলাবদ্ধতা	• জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের লম্বাঘোনা, ডেনলপাড়া, তুতুরবিল, দক্ষিন গয়ালমারা। রত্না পালং ইউনিয়নে ভালুকিয়া, থিমছড়ি, পেচাঁর ডেবা, রুহুল্যারডেবা ও তেলীপাড়া। হলদিয়াপালং ইউনিয়নে সাবেক রুমঁখা, চৌধুরীপাড়া এবং জালিয়াপালং ইউনিয়নের পাইন্যাশিয়া, লম্বরীপাড়া ও সোনাইছড়ি। • ককসবাজার সদর উপজেলা পৌরসভার পেশকারপাড়া, তারাবনিয়ারছড়ার উল্টরাংশ, আলীর জাহাল, ঝিলংজা ইউনিনের চাঁদেরপাড়া, বাংলাবাজার। ভারুয়াখালী, চৌফলদন্ডির নিম্মাঞ্চল। চকরিয়া উপজেলার বদরখালী, রংপুর প্রজেক্ট এলাকা, কোনাখালী, ডেমুশিয়া ; • পেকুয়া উপজেলার উৎনটিয়া, মগনামা, বারবাকিয়া	• অতি বৃষ্টি, • পাহাড়ী ঢল, • পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা না থাক। • খাল, নদী নালা সংস্কার না করা।	জেলার ৮টি উপজেলার ৭,০০০ পরিবার
বন্যহাতির আক্রমন	চকরিয়া উপজেরার ডুলহাজারা ইউনিয়নের পুর্বে এলাকা, খুটাপালংখালী, হারবাং, রামু উপজেলার গর্জনিয়া, ঈদগড়, উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের পাহাড় সংলগ এলাকা ও পাহাড়ী উপত্যকা ।	• পাহাড়ে বন্য হাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব • পাহাড়ের বসতি গড়ে উঠায় ; • পাহারার ব্যবস্থা না থাকা ; • অধিক হারে বৃক্ষ নিধন • হাতির আবাসস্থালে মানুষের আগ্রসন • সরকারের বিভাগ কর্তৃক যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা ; • বৃক্ষ নিধন করা ;	প্রায় ১০০০ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়া/ জলোচ্ছাস	• কুতুবদিয়া উপজেলার ৬ ইউনিয়ন আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ও উত্তর ধুরং ইউনিয়ন সমূহ। • চকরিয়া উপজেলা বদরখালী, কোনাখালী, খুটাখালী, ডুলহাজারা, শাহারবিল, সুরাজপুর মানিকপুর, কাকারা, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা, কৈয়ারবিল, বরইতলী, হারবাং, পূর্ব বড় ভেওলা পশ্চিম বড় ভেওলা, ডেমুশিয়া, ফসিয়াখালী, বমু বিলছড়ি, পৌরসভা, চিরিংগা, লক্ষ্যরচর, কাকারা ; • পেকুয়া উপজেলায় পেকুয়া সদর, রাজাখালী, বারবাকিয়া, মগনামা, টইটং, উজানটিয়া, শিলখালী ইউনিয়ন সমূহ ; • মহেশখালী উপজেলার ধলঘাট, মাতারবাড়ী, কালারমারছড়া, হোয়ানক, বড় মহেশখালী, কুতুবজেুম, মহেশখালী পৌরসভা, ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন সমূহ ; • রামু উপজেলার খুনিয়াপালং, মিটাছড়ি, ফতেখাঁরকুল,	• সঠিক সময়ে সর্তক সংকেত না পাওয়া • আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার অনিহা • দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয় • বঙ্গোপসাগরে তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় কারণে।	সমগ্র জেলার ৪,১৫,৯৫৪ পরিবার

	ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, উয়ারখোপ, রাজারকূল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, খুনিয়া পালং, চাকমারকূল ইউনিয়ন সমূহ । ● কক্সবাজার সদর উপজেলা ঝিলাংজা, পাতলী মাছুয়া খালী, খুরুশকুল, চৌপলদন্ডি, ভারুয়াখালী, পোকখালী, ঈদগাঁও, জালালবাদ, ইসলামাবাদ, ইসলামপুর ইউনিয়ন এবং কক্সবাজার পৌরসভা ; ● উখিয়া উপজেলার জালিয়া পালং ইউনিয়নের সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, লম্বরীপাড়া, সোনাইছড়ি, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদার শফির বিল, রুপপতি, বাইলাখালী, ঈমামের ডেইল, সেপটখালী, মাদারবনিয়া, ও মনখালী, পালং খালী ইউনিয়নের ফাড়িরবিল, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, বালুখালী, গয়ালমারা, ধামনখালী থাইংখালী, রহমতের বিল গ্রাম সমূহ । ● টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিনসহ সমগ্র উপজেলা ।		
পাহাড়ী ঢল/বন্যা	● জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়া পালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের রেজুর খাল নিকটবর্তী এলাকা ; ● কক্সবাজার সদর উপজেলা ও রামু উপজেলার বাঘখালী নদী এলাকাসহ, সদর উপজেলা খুরুশকুল, চৌফলদন্ডি, ভারুয়াখালী, ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, ঈদগাঁও, পিএমখালী, ঝিলংজা ও পৌরসভা এবং রামু সমগ্র ইউনিয়ন সমুহ ; ● মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক, কালারমারছড়া, শাপলাপুর, ছোট মহেশখালী ; চকরিয়া উপজেলার মাতামুহুরী নদীর নিকটবর্তী এলাকা সমূহ ও বদরখালী, ডেমুশিয়া, দরবেশখাটা, শাহারবিল, পশ্চিম বড় ভেওলা, সুরজপুর, মানিকপুর, চিরিংগা, পৌরসভা, লক্ষ্যরচর, ফাসিয়াখালী ; ● পেকুয়া উপজেলার কৈয়ারবিল, টেইটং, পেকুয়া সদর, উজানটিয়া, রাজাখালী, শীলখালী; ● টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা, হোয়াক্যং, বাহারছাড়া, সারবাং, টেকনাফ সদর ইউনিয়ন সমূহ;	● অতি বৃষ্টি ; ● পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা ; ● ভরাট হয়ে খালের গভীর কমে যাওয়া ; ● নদী/খাল দখল হয়ে স্থাপনা নির্মাণ ; ● অপরিকল্পিত রাস্তা তৈরী ; ● স্বাভাবিক মাটি ক্ষয় হয়ে যাওয়া ● রাস্তা নিচু হয়ে যাওয়া; ● খালের দু'পার বনায়ন না থাকা	প্রায় ৩,০০,০০০ পরিবার
কালবৈশাখী	সমগ্র জেলার ৮টি উপজেলা সমূহ	● আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন ● সকর্তার সুযোগ না দেয়া ; ● দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা	সমগ্র জেলার জনগণ
জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন		-	-
জলাবদ্ধতা	● জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের লম্বাঘোনা, ডেনলপাড়া, তুতুরবিল, দক্ষিন গয়ালমারা । রত্না পালং ইউনিয়নে ভালুকিয়া, থিমছড়ি, পেচাঁর ডেবা,	● অতি বৃষ্টি, ● পাহাড়ী ঢল, ● পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা	জেলার ৮টি উপজেলার ৭,০০০ পরিবার

	রুহুল্যারডেবা ও তেলীপাড়া। হলদিয়াপালং ইউনিয়নে সাবেক রুমঁখা, চৌধুরীপাড়া এবং জালিয়াপালং ইউনিয়নের পাইন্যাশিয়া, লম্বরীপাড়া ও সোনাইছড়ি। ● ককসবাজার সদর উপজেলা পৌরসভার পেশকারপাড়া, তারাবনিয়ারছড়ার উল্টরাংশ, আলীর জাহাল, ঝিলংজা ইউনিনের চাঁদেরপাড়া, বাংলাবাজার। ভারুয়াখালী, চৌফলদন্ডির নিম্মাঞ্চল। চকরিয়া উপজেলার বদরখালী, রংপুর প্রজেক্ট এলাকা, কোনাখালী, ডেমুশিয়া ; ● পেকুয়া উপজেলার উৎানটিয়া, মগনামা, বারবাকিয়া	না থাক। ● খাল, নদী নালা সংস্কার না করা।	
বন্যহাতির আক্রমন	চকরিয়া উপজেরার ডুলহাজারা ইউনিয়নের পুর্বে এলাকা, খুটাপালংখালী, হারবাং, রামু উপজেলার গর্জনিয়া, ঈদগড়, উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের পাহাড় সংলগ এলাকা ও পাহাড়ী উপত্যকা ।	● পাহাড়ে বন্য হাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ● পাহাড়ের বসতি গড়ে উঠায় ; ● পাহারার ব্যবস্থা না থাকা ; ● অধিক হারে বৃক্ষ নিধন ● হাতির আবাসস্থালে মানুষের আগ্রসন ● সরকারের বিভাগ কর্তৃক যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা ; ● বৃক্ষ নিধন করা ;	প্রায় ১০০০ পরিবার
লবনাক্ততা	● কুতুবদিয়া উপজেলার ৬ ইউনিয়ন আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ও উত্তর ধুরং ইউনিয়ন সমূহ। ● চকরিয়া উপজেলা বদরখালী, কোনাখালী, খুটাখালী, শাহারবিল, সুরাজপুর মানিকপুর, কাকারা, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা, কৈয়ারবিল, বরইতলী,; ● পেকুয়া রাজাখালী, বারবাকিয়া, মগনামা, টইটং, উজানটিয়া, শিলখালী ইউনিয়ন সমূহ ; ● মহেশখালী উপজেলার ধলঘাট, মাতারবাড়ী, কালারমারছড়া, হোয়ানক, বড় মহেশখালী, কুতুবজেুম, ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন সমূহ ; ● কক্সবাজার সদর উপজেলা ঝিলাংজা, পাতলী মাছুয়া খালী, খুরুশকুল, চৌপলদন্ডি, ভারুয়াখালী, পোকখালী,; ● টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিনসহ সমগ্র উপজেলা।	● ভাঙ্গা ও দুর্বল ভেড়িবাঁধের কারণে। ● বঙ্গোপসাগরে তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় কারণে। ● পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা না থাক। ● খাল, নদী নালা সংস্কার না করা।	সমগ্র জেলার ২,২০,০০০ পরিবার
ভূমিকম্প	● সমগ জেলার কমবেশী উপজেলার এই ভূমিকম্পের ঝুর্কিতে থাকে।	● এর কোন পূর্বাভাস এর ব্যবস্থা না থাকা। ● দুর্বল অবকাঠামো ও বেশীরভাগ কাচাঁ ঘরবাড়ী।	সমগ্র জেলার ২,২৫,২০০ পরিবার

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ ঃ

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	▪ কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় প্রতিবছর সব মৌসুমে কৃষি ফসল ও শস্য উৎপাদন হয়ে	▪ উপযুক্ত জায়গায় সুইচ গেইট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন। ▪ খালের গভীরতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহন।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	থাকে শীত মৌসুমে বেশী হয় । ▪ অতিবৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৩৯,৫৬৮ একর জমির ২০% ফসল ও ১০% সব্জি ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ প্রতিবছর জোয়ারের পানিদ্বারা জেরার প্রায় ১২,২৮০ একর জমির প্রায় ১৫% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ জেলার ৮টি উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৫০,০০০ একর জমির ৩০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ জেলার জলাবদ্ধতার কারণে ৩০,৩০০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ২০,০০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে জেলার ৮টি উপজেলায় ১,৭১,১৬৮একর জমির থেকে প্রায় ৫০% ফসলের ক্ষেত ধংস হয়ে যেতে পারে ।	▪ জেলার বেড়ীবাঁধ মজবুত করার উদ্যোগ গ্রহনসহ বেঁড়ী-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করা । ▪ মেরিন ড্রাইভ সড়ক রক্ষনাবেক্ষন করা । ▪ নদী/খাল খনন করে সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, খাল/নদী সমূহ সংস্কারের মাধ্যমে জোয়ারের পানি থেকে ফসল রক্ষা পেতে পারে । ▪ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক জলাবদ্ধ এলাকায় বিকল্প ফসল ফলানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে । ▪ লবন সহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারন বোরো, আমন, আউস ▪ ঢলের পানি নদীতে বা খালে প্রবাহের ব্যবস্থা করা । ▪ স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়ে খাল খনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা । ▪ আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা ▪ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা ▪ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে কাটা ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া
শিক্ষা	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে জেলার ২০% ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে । শিক্ষা ব্যবস্থার ৪০% ক্ষতি হতে পারে । ৪০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতি সম্মুখিন হতে পারে ।	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উচু স্থানে বা মজবুত ভাবে নির্মান করা । ▪ অধিক বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা করা । ▪ দুর্যোগ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ্রহন । ▪ উপকুলীয় উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে সেন্টার নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করা । ▪ প্রতিষ্ঠনের যাতায়তের রাস্তা মজবুত উঁচু করে তৈরী করা
যোগাযোগ	▪ ১৯৯১ইং সালের মত ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস সংগঠিত হলে ককসবাজার জেলা ৮টি উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ৮টি মূল পোল্ডারের ২০টি শাখা পোল্ডারের অধীনে ৫৫৬.৫৫ কি.মি. বেঁড়ীবাঁধ প্রায় ৩০০কিমি. ক্ষতি হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ১৫কিমি. মেরিন ড্রাইভ সড়ক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । জেলার ২৫০টি স্লুইচ/রেগুলেটর মধ্যে ১৫০টি, ৩০০কি.মি রাস্তা, ৮৯৮টি ব্রীজের মধ্যে ২০০টি, ২,৭৬০টি কালভার্টে ১৫০০টি ক্ষতি হতে পারে । টেলিযোগাগের ক্ষেত্রে ১০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারনে নীচু এলাকা গুলোয় বর্ষা মৌসুমে ৩,০৪৭.৩৪কিমি কাচা রাস্তার প্রায় ২৫০ কিমি কাঁচা ও ৮৫৯.৮২কিমি পাকা রাস্তার ১০০কিমি পাকা রাস্তা, ৯২৬.৫৫কিমি. ব্রিক রাস্তার ৭০ কি:মি ব্রিক সোলিং রাস্তা ডুবে গিয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে ▪ জেলার ৮টি উপজেলায় নিম্নএলাকা সমূহ জলাবদ্ধতার ফলে ৫০কি:মি: রাস্তা চলাচল অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে ।	▪ রাস্তা উঁচু করে তৈরী করা ▪ যথাস্থানে গাইডওয়াল দেয়া । ▪ প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা । ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা । ▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা । ▪ রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপন, ঝাউবন, সৃষ্টির ব্যবস্থা করা ▪ মেরিন ড্রাইভ সড়ক রক্ষানাবেক্ষন করা

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
স্বাস্থ্য	▪ ককসবাজার জেলায় জ উপজেলায় পর্যাপ্ত নলকূপ না থাকায় ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরাসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে । ▪ লবণাক্ততা থাকলে পানীয় জলের অভাবে জনিত কারনে নানাবিধ রোগ বালাই দেখা দিতে পারে । ▪ তাপমাত্রর বৃদ্ধির কারনে ডায়রিয়া এবং অন্যান্য রোগের কারণে প্রায় ২০% লোক স্বাস্থ্যহানী । ▪ জলাদ্ধতার কারণে পানি দূষণ হয়ে ১৫% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড ও চর্ম রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।	▪ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য ▪ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ▪ স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো । ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা । ▪ দুর্যোগের কারনে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা । ▪ পুরাতন সাইক্লোন সেল্টার সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহন ▪ পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা ▪ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ওষধ সরবারহ নিশ্চিত করা ▪ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা
পরিবেশ	▪ জেলায় ব্যাপকভাবে পাহাড়কাটা, পাহাড়ী বৃক্ষ নিধন, প্যারাবন, ঝাউবন নিধন, বসতবাড়ীর বৃক্ষ নিধনের কারণে প্রায় ৫০% বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ▪ জেলার সচেতনতার অভাবে বসতবাড়ীর বৃক্ষনিধন, প্যারাবন কাটার পর লবন চাষ করার ফলে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে । ▪ ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে জেলার অধিকাংশ ৪০% গাছপালার ক্ষতি হতে পারে ।	▪ উপকুলীয় দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ে, মহেশাখালী ব্যাপক ভাবে প্যারাবন, ঝাউবন সৃষ্টি করা উদ্যোগ গ্রহন ; ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ▪ বনায়নে গনজাগরন সৃষ্টি করা ; ▪ মেরিনড্রাইভ সড়কসহ রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা । ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা । ▪ লবনাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বড় ফলদ গাছ খাসিকরণ করা, যাতে মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারে। ▪ নিচু জমিতে বড়গাছ যেমন- ছইলা, কাকড়া ও কেওড়া গাছ লাগাতে হবে। ▪ মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পিভবন রোধ করবে। ▪ অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।
বনজ সম্পদ	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে উপজেলার অধিকাংশ ঝাউবন, পাহাড়, বসতভিটার গাছ-পালা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । ▪ ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে অধিকাংশ পাহাড়কাটা, ঝাউবন, পাহাড়ী গাছ, গাছ-পালা নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক ১.৫ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড় ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে উপজেলার	▪ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা । ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ▪ পাহাড়ে ব্যাপক বনায়ন করা ▪ সমুদ্র সৈকতের মেরিন ড্রাইভ সড়কে ঝাউবন সৃষ্টি করা । ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ▪ বৃক্ষ নিধন ও অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	কয়েক লক্ষ গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।	
মৎসচাষ	▪ ১৯৯১সালে মত ঘূর্ণিঝড় হলে জেলায় সমস্ত চিংড়ি চাষ ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে ; ▪ ২৯টি হ্যাচারির প্রায় ১০০০ কোটি পোন নষ্ট হয়ে যার বাজার মূল্য ২০০কোটি হবে ; ▪ জেলায় কাল বৈশাখী হলে ১০% মৎসচাষ ক্ষতি হতে পারে । ▪ কারেন্ট জালে ও বিহিঙ্গী জাল এর কারণে ২০% সামুদ্রিক মৎস ধবংস হতে পারে ।	▪ মাছ ধরার বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করা ও মৎস্য উৎপাদনকে তরান্বিত করা । ▪ পুকুরের পাড় উঁচুকরণ এবং পুকুর সংস্কার করা । ▪ চিংড়ি ঘেরের পাড় মজবুত করা ▪ বেঁড়ীবাঁধ মেরামত ও নতুনভাবে তৈরী করা ▪ টেকশই চিংড়িঘের প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ▪ ২/৩স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা ; ▪ বন্যা/জরোচ্ছাসের সময় ঘের জালবেষ্টিত রাখা ▪ ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা ▪ হ্যাচারি শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।
আবাসন	▪ জেলায় ১৯৯১সালে মত সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে প্রায় ৫০০০ মাটির বাড়ি ও আধাপাকা ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে পারে ▪ জেলায় ১৯৯১সালে মত ঘূর্ণিঝড় ২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৪০% মাটির বাড়ি ও আধাপাকা বাড়ী ক্ষতি হতে পারে । ▪ জেলায় কাল বৈশাখী হলে ২০ % ঘর বাড়ি ক্ষতি হতে পারে । ▪ জেলায় সামুদ্রিক জোয়ার, অতি বৃষ্টির কারণে প্রায় ১০% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে	▪ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার করা । ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা । ▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা । ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা । ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা ।
জীবিকা	▪ ঘূর্নিঝড়: ঘূর্নিঝড়ের কারনে প্রায় ৫,০০০জন মৎস্যজীবির, ২০,০০০জন কৃষিজীবি, ১০,০০০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ও ৯,০০০জন কৃষি শ্রমিকের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ▪ লবনাক্তোতা : প্রায় ৫,০০০জন কৃষিজীবির ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবনের কারনে ৪,০০০জন মৎস্যজীবি মৎস্যজীবি প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ▪ জলাবদ্ধতা : প্রায় ২,০০০জন মস্যজীবি, ৩,০০০ জন কৃষিজীবি মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ▪ বন্যা: বন্যার কারনে জেলার প্রায় ২৫,০০০ জন মৎস্যজীবি, ৫,০০০ জন কৃষিজীবি, ১,০০০জন ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	▪ বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা ; ▪ বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা করা; ▪ মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে বিকল্পআয়ের ব্যবস্থা করা ; ▪ স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ; ▪ জনগোষ্টি ভিত্তিক সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা ; ▪ সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা ; ▪ বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা;
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	▪ ঘূর্নিঝড়: ঘূর্নিঝড়ের কারনে জেলার ৩৩৫৪টি কুটির শিল্প মধ্যে ২৫০০টি ও ১৪১৭টি ক্ষুদ্রশিল্প মধ্যে ৮৫০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	▪ বিকল্প শিল্প সৃষ্টি করা ; ▪ বিকল্প শিল্প সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা করা; ▪ স্থানীয় শিল্প সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ; ▪ জনগোষ্টি ভিত্তিক সামাজিক শিল্প সৃষ্টি করা ; ▪ বিপদাপন্ন শিল্প চিহ্নিত করে উন্নয়ন করার জন্য সহায়তা প্রদান করা;

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

এই মানচিত্রে উপজেলার সামাজিক অবস্থা এক নজরে দেখানো হলো । মানচিত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রদান প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পদ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে এই মানচিত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে ।

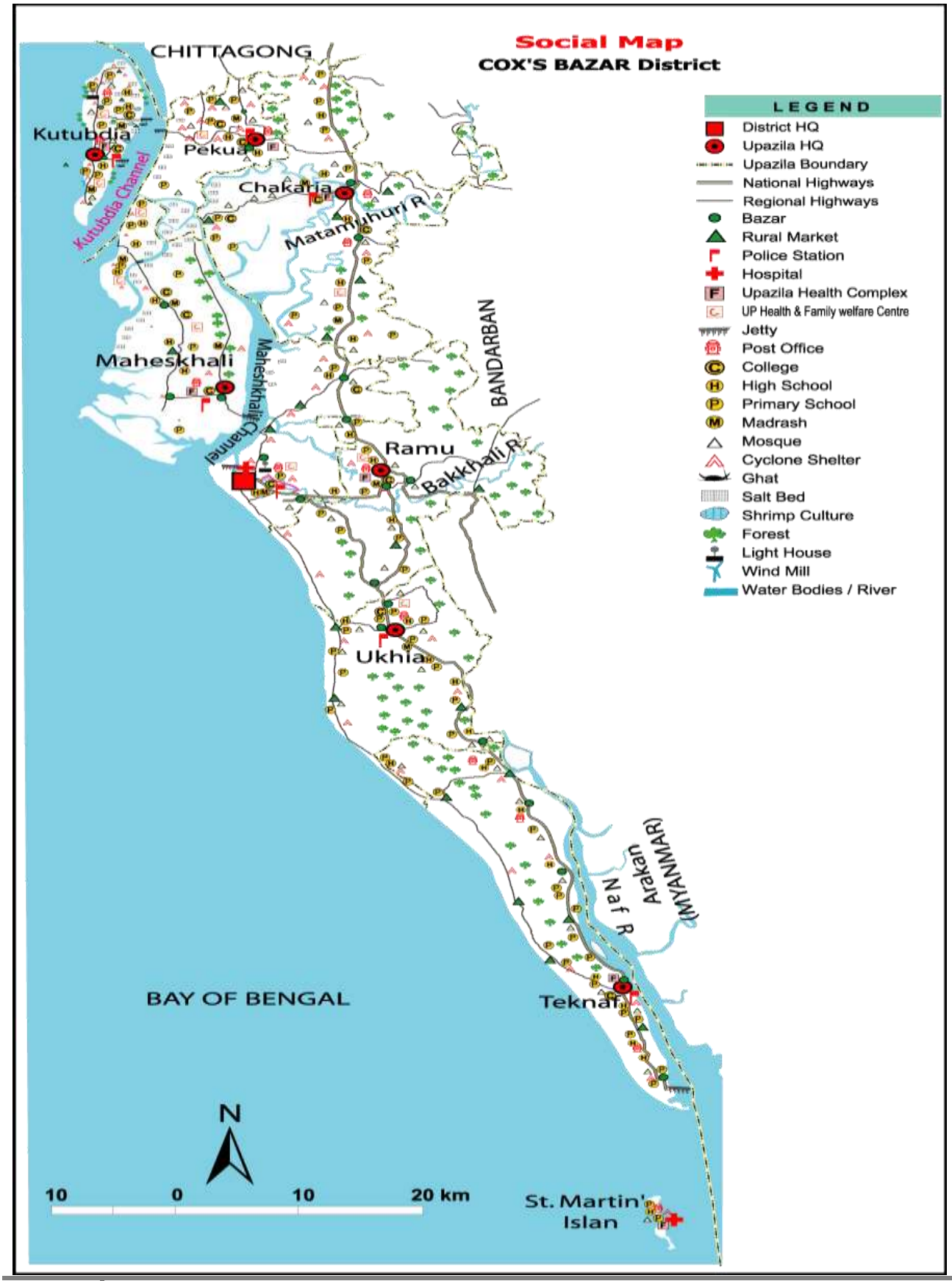

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ এই মানচিত্রে কুতুবদিয়া উপজেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণে সৃষ্ট আপদ ও ঝুকিঁ দেখানো হয়েছে ।

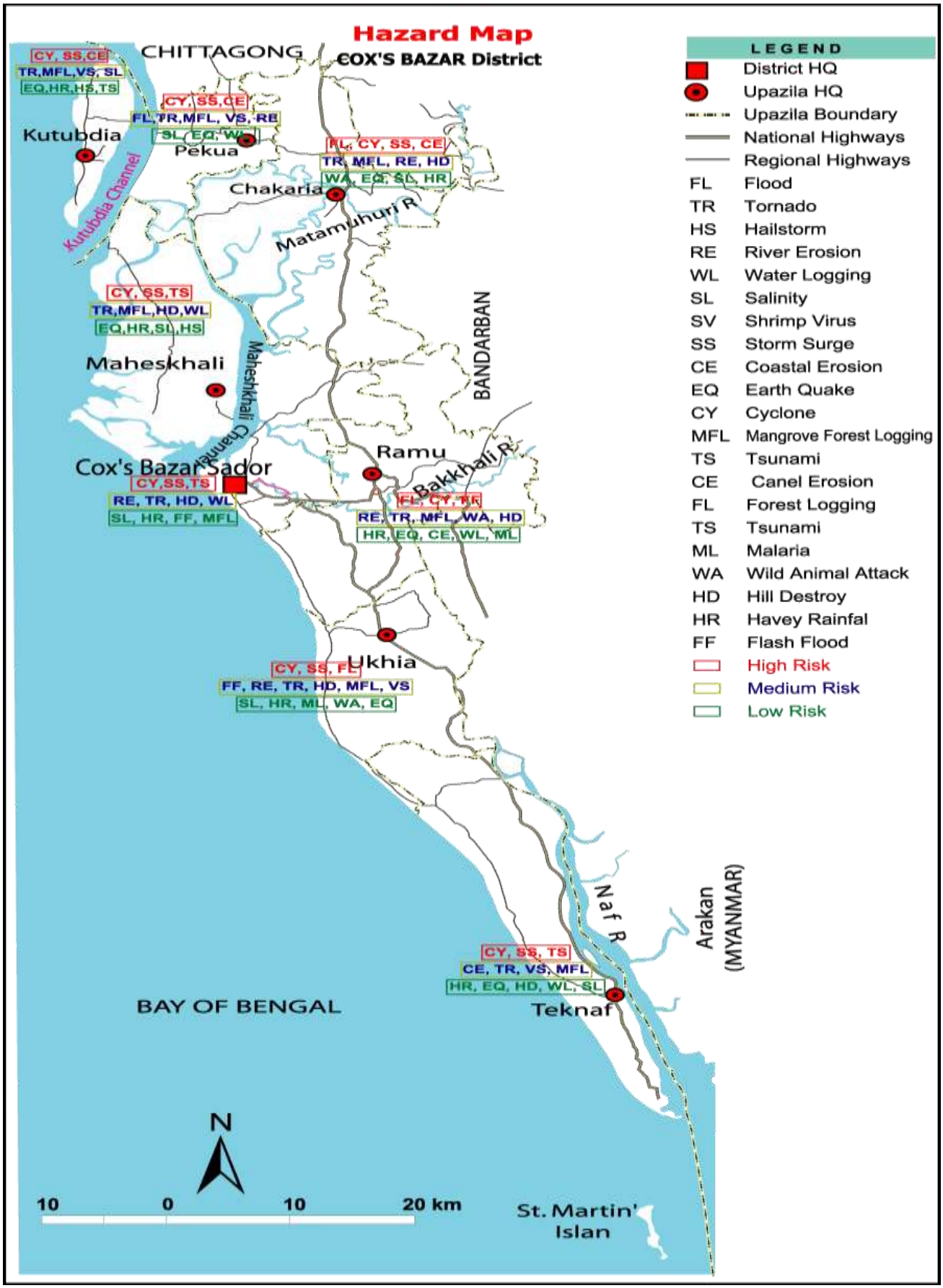

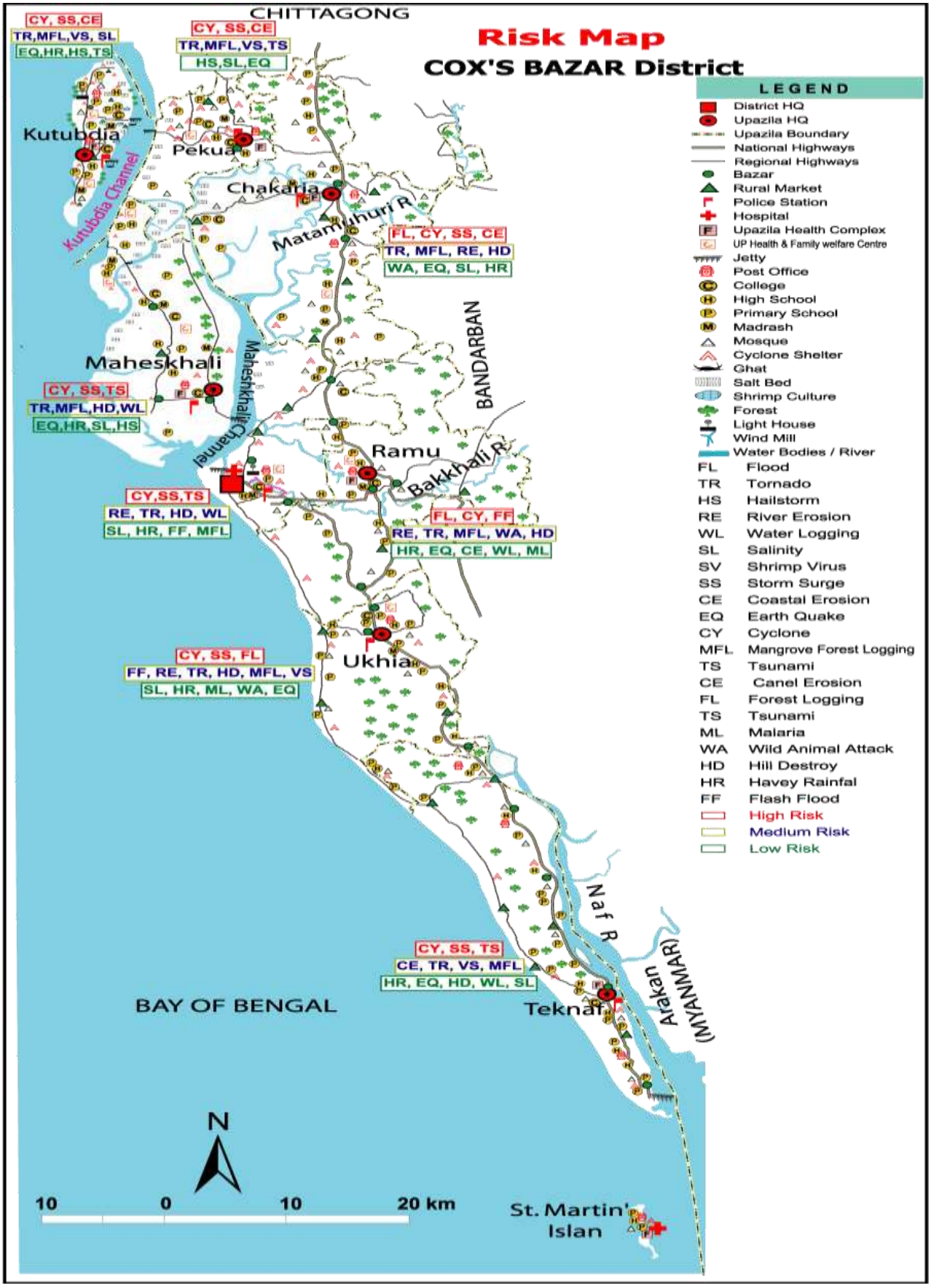

Risk Map
COX'S BAZAR District
CHITTAGONG
BANDARBAN
BAY OF BENGAL
Arakan (MYANMAR)
Kutubdia
Kutubdia Channel
Pekua
Chakaria
Matamuhuri R
Maheskhali
Maheskhali Channel
Ramu
Bakkhali R
Ukhia
Teknaf
Naf R
St. Martin's Islan
CY, SS,CE
TR,MFL,VS, SL
EQ,HR,HS,TS
CY, SS,CE
TR,MFL,VS,TS
HS,SL,EQ
FL, CY, SS, CE
TR, MFL, RE, HD
WA, EQ, SL, HR
CY, SS,TS
TR,MFL,HD,WL
EQ,HR,SL,HS
CY,SS,TS
RE, TR, HD, WL
SL, HR, FF, MFL
FL, CY, FF
RE, TR, MFL, WA, HD
HR, EQ, CE, WL, ML
CY, SS, FL
FF, RE, TR, HD, MFL, VS
SL, HR, ML, WA, EQ
CY, SS, TS
CE, TR, VS, MFL
HR, EQ, HD, WL, SL
N
10 0 10 20 km
LEGEND
District HQ
Upazila HQ
Upazila Boundary
National Highways
Regional Highways
Bazar
Rural Market
Police Station
Hospital
Upazila Health Complex
UP Health & Family welfare Centre
Jetty
Post Office
College
High School
Primary School
Madrash
Mosque
Cyclone Shelter
Ghat
Salt Bed
Shrimp Culture
Forest
Light House
Wind Mill
Water Bodies / River
FL Flood
TR Tornado
HS Hailstorm
RE River Erosion
WL Water Logging
SL Salinity
SV Shrimp Virus
SS Storm Surge
CE Coastal Erosion
EQ Earth Quake
CY Cyclone
MFL Mangrove Forest Logging
TS Tsunami
CE Canel Erosion
FL Forest Logging
TS Tsunami
ML Malaria
WA Wild Animal Attack
HD Hill Destroy
HR Havey Rainfal
FF Flash Flood
High Risk
Medium Risk
Low Risk

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

আপদ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
ঘূর্ণিঝড়												
পাহাড়ীঢলে বন্যা												
কালবৈশাখী												
উপকুল ভাঙ্গন												
জলাবদ্ধতা												
বন্যহাতির উৎপাত												
ভূমিকম্প												
লবনাক্তা												

❖ মৌসুমী দিনপঞ্জী বিশ্লেষণ:

- ঘুর্ণিঝড়: ককসবাজার বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পাহাড়-সমুদ্র,নদী-খাল সমন্বয়ে গঠিত একটি জনপদ। ভৌগলিক অবস্থানজনিত কারণে জেলায় ঘুর্নিঝড় একটি অন্যতম আপদ। সাধারণত:বৈশাখ,জৈষ্ঠ্য মাস এবং আশ্বিন ,কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ঘুর্নিঝড় বেশী আঘাত হানে। ঘুর্নিঝড়ে এই জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া,মহেশখালীসহ উপকুলীয় অঞ্চলের বেড়ীবাধ,চিংড়িঘের, এখানকার কাচাঁ ঘরবাড়ি,পানের বরজ,কৃষি ফসল,গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।ঘূর্নিঝড়ের গতি বেশী হলে অনেক জায়গায় প্রানহানির আশংকা রয়েছে। তাছাড়া ঘূর্নিঝড়ের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়।
- জলাবদ্ধতা: ককসবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা অতিসম্প্রতি ব্যপক আকার ধারন করেছে। পানির প্রবাহের পথ সংকুচিত হওয়া,খাল-ছরা ভরাট হয়ে যাওয়া,অপরিকল্পিত বাধ নির্মান,পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাথাকা সহ নানা কারণে আষাঢ়,শ্রাবন ও ভাদ্র এই তিন মাসে জলাবদ্ধত সৃষ্টি হয়।
- পাহাড়ি ঢল/বন্যা: ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক কারণে এই জনপদে অনেক ছোট বড় নদী,খাল,ছরা রয়েছে।বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির সময়ে এই সমস্ত নদী, খাল ও ছরা বেয়ে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল বৃষ্টির পানিতে অনেক এলাকা তরিয়ে যায়। তাই এটি উখিয়া উপজেলার জন্য মারাত্মক ঝুকি সৃষ্টিকারী আপদ।এই আপদের কারণে কৃষিফসল, বীজতলা,চিংড়ি ঘের,পুকুর ও জলাশয়ের মাছ ভেসে যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় কাচাঁ ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়।
- কালবৈশাখী : কালবৈশাখীর কারণে পানের বরজ,ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া ব্যাপক পরিমাণ গাছ উপড়ে পড়ে এবং কাচাঁঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায়। কালবৈশাখী প্রধানত: বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে আঘাত করে থাকে।
- উপকুল ভাঙ্গন : এই জনপদে অনেক ছোট বড় খাল,ছরা রয়েছে। রয়েছে সমুদের তীরবর্তী এলাকা। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি, বন্যা, জোয়ার পানি ইত্যাদির কারণে ছোট-বড় খাল ও ছরা বেয়ে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, ও স্রোতের তোরে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এছাড়া জোয়ারের পানি ধাক্কা উপকুল এলাকার বেড়ী বাধ ও উপকুল এলাকা ভেঙ্গে যায়।
- ভূমিকম্প: বছরের যেকোন সময় ভূমিকম্প হতে পারে। বাংলাদেশ এবং পার্শবতী অঞ্চল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এলাকাটি মাঝারী মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। ভুমিকম্পের বিগত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে বৃহত্তম ভুমিকম্প হয়। ১৯৯৯ সালে ২২ জুলাই উপজেলা মহেশখালীতে মাঝারী ভু-কম্পন হয়। এতে ৭জনের মৃত্যু ও ২০০জন আহত ও অসংখ্য ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়া ২০০৪ সালের ইন্দোনিশিয়ার সুনামীর কারণে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলতে এর প্রভাব অনুভূত হয়। তবে মাঝারী আকারের ভূমিকম্প ও সুনামী হলে জেলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
- বন্য হাতির উৎপাতঃ বছরের আষাঢ়-ভাদ্র ও অগ্রাহায়ণ-পৌষ মাসে পাহাড় এলাকায় বিশেষভাবে উখিয়া, টেকনাফ ও রামু উপজেলায় বন্য হাতির আক্রমণ হয়ে থাকে। মূলতঃ কোন ফসলী মৌসমে এরা খাবারের খোজে ধানের জমিতে আক্রমণ করে। এরা ব্যাপক ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বনের পাশে সাধারণ মানুষের বসতভিটা ক্ষতি করে থাকে। সেইসাথে মানুষের জানমালেরও ক্ষতি সাধন করে থাকে।
- লবনক্ততাঃ লবনাক্ততা একটি বড় আপদ এই জেলার জন্য। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার কারণে জেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ উপজেলা বছরের আষাঢ় হতে আশ্বিন মাসে লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বেড়ে যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জী ঃ

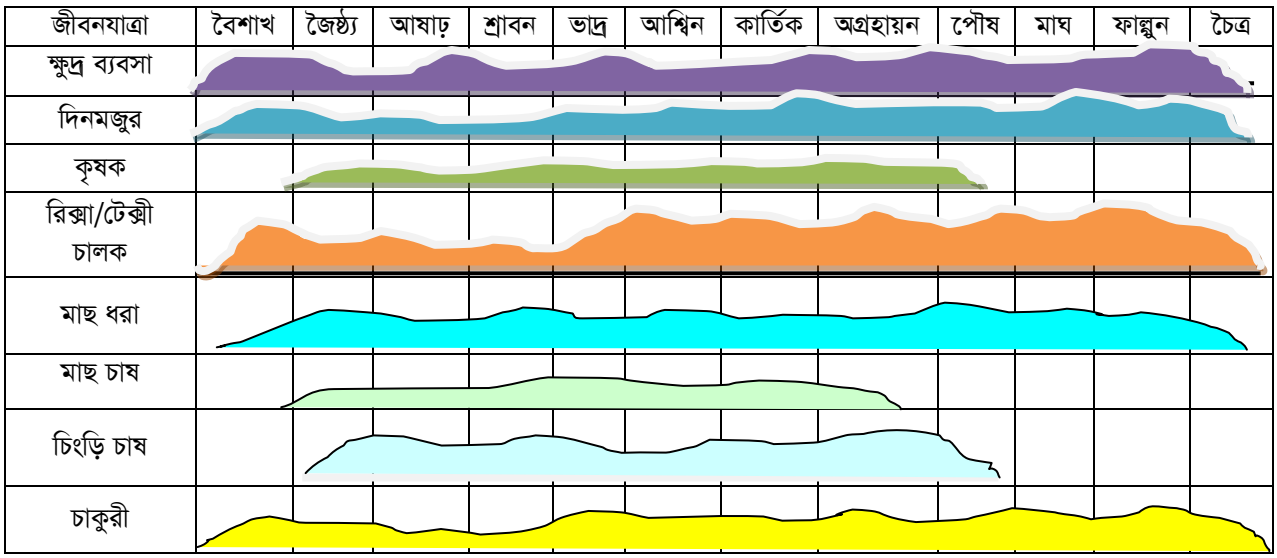

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্র/নং	জীবিকাসমূহ	পাহাড়ী ঢল ও বন্যা	ঘূর্নিঝড়/ জলোচ্ছাস	পাহাড়কাটা /বৃক্ষ নিধন	খালের দু'পাড় ভাঙ্গন	ম্যালে-রিয়া	অতিবৃষ্টি	বন্যহাতির আক্রমণ	কাল বৈশাখী	পানির অভাব
০১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	■	■		■	■	■		■	
০২	দিনমজুর	■	■		■	■	■	■	■	■
০৩	কৃষক	■	■	■	■	■	■	■	■	■
০৪	রিক্সা/টেক্সী চালক	■	■		■	■	■		■	■
০৫	মাছ ধরা	■	■		■		■		■	■
০৬	মাছ চাষ	■	■	■	■		■			■
০৭	চিংড়ি চাষ	■	■	■	■		■			■
০৮	চাকুরী		■			■	■			

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা ঃ

কক্সবাজার জেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ

ক্রমিক নং	আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ													
		ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	হাঁস মুরগী	গরু ছাগল	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস্য	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	আশ্রয়কেন্দ্র
১.	পাহাড়ী ঢল ও বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২.	ঘুর্ণিঝড় / জলোচ্ছাস	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৩.	পাহাড়কাটা/বৃক্ষ নিধন			■		■					■	■	■		
৪.	জোয়ারের পানি	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■		
৫.	খালের দু'পাড় ভাঙ্গন	■	■	■		■					■	■	■	■	■
৬.	অতিবৃষ্ঠি	■	■	■	■		■	■	■	■		■		■	
৭.	কালবৈশাখী			■	■		■	■		■					
৮.	বন্যহাতির আক্রমণ	■		■	■								■		

১. কক্সবাজার জেলার ১৯৯১, ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে ককসবাজার জেলার কুতুবদিয়ার উপজেলার সমগ্র এলাকা, মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজোম, কালারমারছড়া ও হোয়ানক ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ, শাপলাপুর ইউনিয়নের বৃহদাংশ, মহেশখালী পৌরসভার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ এবং ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের কিয়দাংশ; একইভাবে চকরিয়া উপজেলার বদরখালী ইউনিয়ন, পেকুয়া উপজেলার মগনামা, উজানটিয়া ইউনিয়ন; ককসবাজার সদর উপজেলার খুরুস্কুল, চৌফলদন্ডি, পৌরসভার নাজিরারটেক, সমিতিপাড়া, উত্তর ফদনার ডেইল, নুনিয়ারছড়া, কলাতলী, উখিয়া উপজেলার জালিপালং ইউনিয়নের সোনাইছড়ি, সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদ শফিরবিল, রুপপতি, ছোয়াংখালী, ইমামের ডেইল, বাইলাখালী, সেপটখালী ও মনখালী এবং পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, ফাড়িরবিল, থাইংখালী; টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, বাহারছড়া, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইউনিয়ন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সমস্ত এলাকার ৮০% চিংড়িঘের পানিতে ভেসে যেতে পারে, ৬০%পানের বরজ, ৪০%মাটির তৈরী বাড়ি ও ২০% টিনের বাড়ী ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাছাড়া রেজু খাল ব্রিজ এলাকা হতে দক্ষিণে মনখালী পর্যন্ত সমদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা ৪০ টি ছোট বড় চিংড়ি হ্যাচারির ব্যপক ক্ষতি হবে।পাশাপাশি পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে নির্মানাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়ক বিলীন হওয়া এবং হোটেল-মোটেল সমুহের ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে পালংখালী ইউনিয়নের ফসল ১৫০০ একর জমির চিংড়ি ঘের ,বেড়ি বাধঁ এবং প্যারাবন নষ্ট হয়ে যাবে। পাহাড়ী ঝুকি পূর্ণ এলাকায় বসবাসরত প্রায় ২০০০ পরিবার ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। এই জনপদের রক্ষাকবজ বেরী বাধগুলি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ফলে বিলীন হয়ে অথবা ভেঙ্গে গিয়ে পুরো এলাকা অরক্ষিত হয়ে যেতে পারে।

প্রতিটি খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনার বিপদাপন্নতার বিস্তারিত বর্ণনাঃ

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
পরিবেশ	পাহাড়, বৃক্ষ নিধনের ফলে গাছ পালা কমে গিয়ে পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশর উপর বিরূপ প্রভাব দেখা যেতে পারে।	পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা সর্ম্পকে জনগনকে সচেতন করতে হবে। পাহাড়কাটা বন্ধের আইন কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগীতায় চারা রোপন করতে হবে।
রাস্তাঘাট	সমাজের উচ্চ প্রভাবশালী লোকজন দ্বারা নিজেদের সেচ কাজের সুবিধার্থে রাস্তা কেটে ড্রেন র্নিমান করা এবং অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, রাস্তায় ড্রেইন ব্যবস্থা না থাকা ও পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার দুই পাশে ভেঙ্গে যাচ্ছে।	ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক রাস্তা কেটে ড্রেইন র্নিমানে বাঁধা দেওয়া, রাস্তার দুই পাশে বনায়ন উদ্যোগ নেয়া এবং অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘেড় না করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
গাছপালা	বৃক্ষ নিধনের কারণে ফলজ ও বনজ গাছ কমে যাচ্ছে। এছাড়া বয়সী চারা রোপন করায় গাছের মূল মাটির গভীরে না থাকার কারণে ঝুকিপূর্ন গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	জনসাধারনকে সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা। সেই সাথে কম বয়েসী চারা রোপন করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা এবং ঔষধি চার রোপন করার উপকারিতা সর্ম্পকে প্রচার প্রচারনা করা।
ফসল	অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ফসলী জমিতে বসতবাড়ী করা, সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় লবনাক্ততার কারণে মাটির ফসল উৎপন্ন শক্তি হ্রাস পাওয়া	কৃষি অধিদপ্তর কর্তৃক স্যলাইনিটি সহনীয় ফসল উৎপাদনে কৃষক দের উদ্বুদ্ধ করা
খাবার পানি	ভুগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যাওয়া ও সমুদ্র উপকুলীয় এলকা হওয়ায় পানিতে লবনাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া।	কম খরচে বিশুদ্ধ পানির প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সহজলভ্য ঢেঁকিকলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে রেইন ওয়াটার হারভেষ্ট করা

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
স্বাস্থ্য	বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল হতে জরুরী প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা সুবিধার জন্য জেলা বা বিভাগীয় শহরে যাতায়াত সহজ না হওয়া, জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল হাসপাতালও চিকিৎসা সুবিধা, পাহাড়ী এলাকা বিধায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ এলাকায় না থাকা, ওজা বৈদ্য, কবিরাজের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ায় । জলাবদ্ধতা/বাড়ি ঘরে পানি জমে থাকা । স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব ।	স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবা জনগণের দোর গোরায় পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে জিও/ এজিওর প্রচার প্রচারনা চালানো, গ্রাম পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্দ্যেগে স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন । ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে । স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে । তুলণামূলক উঁচু স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করতে হবে । টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা করতে হবে ।
শিক্ষা	দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হওয়ায় স্কুলগুলোর দুর্বল অবকাঠমোর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদাপন্নতায় থাকে এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় ।	স্থানীয় সরাকরে মাধ্যমে স্কুল গুলো পাকা ভবন র্নিমান ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্র গুলোকে স্কুল হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দ্যেগ নেওয়া । দুর্যোগকালীন সময় স্কুল চালানোর ব্যবস্থা করা ।
মৎস	মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্রগুলো ভরাট বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ও র্নিবিচারে পোনা নিধন করা । খালের কাছাকাছি বা নীচু এলাকায় পুকুরের অবস্থান এবাং পুকুরের পাড় উঁচু না করা । পুকুরের চার পাশে গাছ না লাগানো । লবণাক্ত পানি সহজে পুকুরে প্রবেশ করে ।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে মাছের ডিম ছাড়া সময় মৎস্য আহরণ না করার জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তক তৃণমুল পর্যায়ে প্রচার প্রচারনা চালানো, পুকুরের পাড় উঁচু এবং পুকুর সংস্কার করা এবং পুকুরের চারপাশে গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করা । '
হাট-বাজার	পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় হাট বাজার গুলো প্লাবিত হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে । দুর্বল অবকাঠামো ।	পরিকল্পিত ভাবে ড্রেইন র্নিমান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহে মজবুত রাস্তা তৈরীর জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেওয়া এবং বাজারের চারপাশে বনজ ও ফলজ গাছ লাগানো ব্যবস্থা করা ।
ঘরবাড়ী	সমুদ্রের কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় বসতভিটার অবস্থান অর্থাৎ অপরিকল্পিত বসতভিটা এবং দূর্বল অবকাঠামো	বসতভিটার অবস্থান নদী হতে দুরে ও উঁচু জায়গায় নির্মান করা ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ : কৃষি, মৎস, গাছপালা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পানি, অবকাঠামো, শিক্ষা ও পর্যটন :-

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	কক্সবাজার জেলায় ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, জোয়ারের পানি, খালের পাড় ভাঙ্গন, অতি বৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও বন্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি খাত ব্যাপক হুমকির মুখে পড়বে । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে । জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে কক্সবাজার জেলার জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য প্রভাব পরিলক্ষিত ও অনুমান করা যেতে পারে । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে ঘূর্ণিঝড়/জল্লোচ্ছাস, কালবৈশাখী ঝড়, অতি বৃষ্টি/আকস্মিক বন্যা,খরার মত প্রাকৃতিক বির্পয়য় ঘটতে পারে । বিশেষ করে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, পেকুয়া, টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা প্রায় কয়েক হাজার একর ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে । কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় প্রতিবছর সব মৌসুমে কৃষি ফসল ও শস্য উৎপাদন হয়ে থাকে । অতিবৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৩৯,৫৬৮ একর জমির ২০% ফসল ও ১০% সব্জি ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ।প্রতিবছর জোয়ারের পানিদ্বারা জেরার প্রায় ১২,২৮০ একর জমির প্রায় ১৫% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ।জেলার ৮টি উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৫০,০০০ একর জমির ৩০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । জেলার জলাবদ্ধতার কারণে ৩০,৩০০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ২০,০০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে জেলার ৮টি উপজেলায় ১,৭১,১৬৮একর জমির থেকে প্রায় ৫০% ফসলের ক্ষেত ধংস হয়ে যেতে পারে । কৃষিজীবিরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে । শহর ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে । ফলে খাদ্য ঘাটতি হবে । কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে । পাশাপাশি অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যাহত সম্ভাবনা রয়েছে ।
মৎস্য/চিংড়ী	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে ঘূর্ণিঝড়/জল্লোচ্ছাস, কালবৈশাখী ঝড়, অতি বৃষ্টি/আকস্মিক

খাতসমূহ	বর্ণনা
	বন্যা,খরার মত প্রাকৃতিক বির্পয়য় ঘটতে পারে। মাছের প্রজনন জায়গা বিলুপ্তি। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ফলে মৎস সম্পদের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি মৎস প্রজনন স্থান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে জেলে বা মৎস্যজীবিরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে। ১৯৯১সালে মত ঘূর্ণিঝড় হলে জেলায় সমস্ত চিংড়ি চাষ ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে ; ২৯টি হ্যাচারির প্রায় ১০০০ কোটি পোন নষ্ট হয়ে যার বাজার মূল্য ২০০কোটি হবে ;জেলায় কাল বৈশাখী হলে ১০% মৎসচাষ ক্ষতি হতে পারে। কারেন্ট জালে ও বিহিঙ্গী জাল এর কারণে ২০% সামুদ্রিক মৎস ধবংস হতে পারে।
গাছপালা (বনায়ন ও পরিবেশ)	কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড় ও বৃক্ষ নিধন এর কারণে গাছপালা কমে গিয়ে পরিবেশ ভারষাম্য হারিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অতিবৃষ্টি, পাহাড় নিধন, বন্যার কারণে পলিমাটি সাগরে পড়ে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মত আপদের কারণে বিভিন্ন ফলজ, বনজ গাছসহ প্রভৃতি গাছ বিলুপ্ত হবে। এর ফলে প্রায় ৫০% বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। জেলার সচেতনতার অভাবে বসতবাড়ীর বৃক্ষনিধন, প্যারাবন কাটার পর লবন চাষ করার ফলে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে। ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে জেলার অধিকাংশ ৪০% গাছপালার ক্ষতি হতে পারে
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার, পানীয় জল, তাপমাত্রা ইত্যাদি'র ক্ষেত্রে আমুর পরিবর্তন আসতে পারে। যার ফলে মানুষের নানা ধরণের রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। পাহাড়ী এলাকা মশার উপদ্রুপ বেশী। বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়ে নানা ধরনের রোগের পাদুর্ভাব হতে পারে। ফলে দারিদ্র পরিবারগুলো চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। মানুষের স্বাস্থ্য হানি হবে। ফলে তারা আয়মূলক কাজে অংশ নিতে পারবেনা। ফলশ্রুতিতে এলাকার দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।
জীবিকা	অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পাহাড়ী ঢলে বন্যা, জলোচ্চাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন আপদ মূলতঃ সার্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক আপদ। এই সবের কারণে সময়-অসময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে কৃষি, শিক্ষা, অবকাঠামো ও মৎস্যসহ বিভিন্ন খাতসমূহ মারাত্নক হুমকির মুখে পড়বে। অত্র এলাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণ জনগণ পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে। পরিবর্তিত নতুন পেশায় দক্ষতা কম থাকায় কাজ করতে কষ্ট হবে ফলে ভুক্তারা আর্থিক ও শারিরীক সংকটে পড়বে। ঘূর্নিঝড়: ঘূর্নিঝড়ের কারনে প্রায় ৫,০০০জন মৎস্যজীবির, ২০,০০০জন কৃষিজীবি, ১০,০০০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ও ৯,০০০জন কৃষি শ্রমিকের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লবনাক্তোতা : প্রায় ৫,০০০জন কৃষিজীবির ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবনের কারনে ৪,০০০জন মৎস্যজীবি মৎস্যজীবি প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জলাবদ্ধতা : প্রায় ২,০০০জন মস্যজীবি, ৩,০০০ জন কৃষিজীবি মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যা: বন্যার কারনে জেলার প্রায় ২৫,০০০ জন মৎস্যজীবি, ৫,০০০ জন কৃষিজীবি, ১,০০০জন ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
অবকাঠামো ও যোগাযোগ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আকস্মিক বন্যার মত প্রাকৃমিক দুর্যোগের বেড়ে যাবে। ফলে উপকূলীয় তীরবর্তী এলাকা অবকাঠামো হুমকির মধ্যে পড়বে। ফলে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, আশ্রয় কেন্দ্র, দালানসহ সকল অবকাঠমো রক্ষা করা কঠিন হবে। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের প্রভাবে গ্রামগুলো প্লাবিত হবে। অনেক লোকজন গৃহহীন হয়ে বসতি এলাকা পরিবর্তন করবে। ১৯৯১ইং সালের মত ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস সংগঠিত হলে ককসবাজার জেলা ৮টি উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ৮টি মূল পোল্ডারের ২০টি শাখা পোল্ডারের অধীনে ৫৫৬.৫৫ কি.মি. বেঁড়ীবাঁধ প্রায় ৩০০কিমি. ক্ষতি হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ১৫কিমি. মেরিন ড্রাইভ সড়ক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। জেলার ২৫০টি স্লুইচ/রেগুলেটর মধ্যে ১৫০টি, ৩০০কি.মি রাস্তা, ৮৯৮টি ব্রীজের মধ্যে ২০০টি, ২,৭৬০টি কালভার্টে ১৫০০টি ক্ষতি হতে পারে। টেলিযোগাগের ক্ষেত্রে ১০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারনে নীচু এলাকা গুলোয় বর্ষা মৌসুমে ৩,০৪৭.৩৪কিমি কাচা রাস্তার প্রায় ২৫০ কিমি কাঁচা ও ৮৫৯.৮২কিমি পাকা রাস্তার ১০০কিমি পাকা রাস্তা, ৯২৬.৫৫কিমি. ব্রিক রাস্তার ৭০ কি:মি ব্রিক সোলিং রাস্তা ডুবে গিয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে জেলার ৮টি উপজেলায় নিম্নএলাকা সমূহ জলাবদ্ধতার ফলে ৫০কি:মি: রাস্তা চলাচল অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।
শিক্ষা	শিক্ষা খাতও জলবায়ু পরিবর্তনের স্বীকার হবে। বিশেষভাবে অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য খাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে জেলার ২০% ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার ৪০% ক্ষতি হতে পারে। ৪০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতি সম্মুখিন হতে পারে।
পর্যটন	কক্সবাজারকে বাংলাদেশের পর্যটন নগরী বলা হয়। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটক এই জেলায় ভ্রমণ করে থাকেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পর্যটন শিল্পের এক ধরণের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখানে ঘূণিঝড় ও জল্লোচ্ছাস সৃষ্টি হবে এবং অসহিষ্ণু আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। ফলে এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্প হুকিতে মধ্যে পড়তে পারে। এছাড়া সাধারণ পর্যটকদের জীবন ঝুঁকি, যাতায়াতের অসুবিধা, পর্যটন স্পটসমূহ ধবংস দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবে পর্যটনের জন্য মারাত্নক ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
<u>ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস</u> ১৯৯১, ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে ককসবাজার জেলার কুতুবদিয়ার উপজেলার সমগ্র এলাকা, মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজোম, কালারমারছড়া ও হোয়ানক ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ, শাপলাপুর ইউনিয়নের বৃহদাংশ, মহেশখালী পৌরসভার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ এবং ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের কিয়দাংশ; একইভাবে চকরিয়া উপজেলার বদরখালী ইউনিয়ন, পেকুয়া উপজেলার মগনামা, উজানটিয়া ইউনিয়ন; ককসবাজার সদর উপজেলার খুরুস্কুল, চৌফলদন্ডি, পৌরসভার নাজিরারটেক, সমিতিপাড়া, উত্তর ফদনার ডেইল, নুনিয়ারছড়া, কলাতলী, উখিয়া উপজেলার জালিপালং ইউনিয়নের সোনাইছড়ি, সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদ শফিরবিল, রুপপতি, ছোয়াংখালী, ইমামের ডেইল, বাইলাখালী, সেপটখালী ও মনখালী এবং পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, ফাড়িরবিল, থাইংখালী; টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, বাহারছড়া, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইউনিয়ন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সমস্ত এলাকার ৮০% চিংড়িঘের পানিতে ভেসে যেতে পারে, ৬০%পানের বরজ, ৪০%মাটির তৈরী বাড়ি ও ২০% টিনের বাড়ী ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাছাড়া রেজু খাল ব্রিজ এলাকা হতে দক্ষিণে মনখালী পর্যন্ত সমদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা ৪০ টি ছোট বড় চিংড়ি হ্যাচারির ব্যপক ক্ষতি হবে।পাশাপাশি পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে নির্মানাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়ক বিলীন হওয়া এবং হোটেল-মোটেল সমুহের ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে পালংখালী ইউনিয়নের ফসল ১৫০০ একর জমির চিংড়ি ঘের ,বেড়ি বাধঁ এবং প্যারাবন নষ্ট হয়ে যাবে। পাহাড়ী ঝুকি পূর্ণ এলাকায় বসবাসরত প্রায় ২০০০ পরিবার ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। এই জনপদের রক্ষাকবজ বেরী বাধগুলি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ফলে বিলীন হয়ে অথবা ভেঙ্গে গিয়ে পুরো এলাকা অরক্ষিত হয়ে যেতে পারে।	✓ তাৎক্ষনিক কারণগুলো যেমন, তাপ মাত্রা বৃদ্ধি, ✓ সংকেত না পাওয়া, ✓ আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা না থাকা, ✓ সর্তক বানীর অর্থ না বুঝা, ✓ স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার ফলে মহিলারা আশ্রয় কেন্দ্রের যেতে চায়না।	✓ সচেতনতার অভাব, ✓ সর্তক বানীর গুরুত্ব না দেওয়া, ✓ শক্ত ও মজবুত করে ঘর তৈরী না করা।	✓ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নাই, ✓ প্যারাবন না থাকা. ✓ বেড়ী বাধ না থাকা, ✓ পর্যাপ্ত সেন্টার না থাকা, ✓ -পাহাড় কাটা, ✓ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা, ✓ আবহাওয়া পরিবর্তন, ✓ পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আগাম সংকেত না দেওয়া। ✓ অপরিকল্পিত পর্যটন শিল্প ও হ্যাচারি জোন গড়ে উঠা।
<u>পাহাড়ী ঢল /বন্যাঃ</u> ককস্বাজার জেলার উখিয়া, রামু, চকরিয়া, ককসবাজার সদর উপজেলার মধ্য দিযে কয়েকটি নদী ও অসংখ্য ছোট বড় খাল প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম মাতামুহুরী, বাকখালী, রেজু। এসমস্ত নদী, ছোট বড় খাল ও ছরা পার্শ্ববর্তী জেলা বান্দরবান এর পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে লোকালয় দিয়ে একেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নাফ, কোহেলিয়া নদী এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।ফলে বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষনের সময় এ সমস্থ খাল,নদী ও ছরার দু'পাশের এলাকা সমুহ আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয়। এধরনের পাহাড়ি ঢল ও বন্যায় চকরিয়া উপজেলার শাহারবিল ইউনিয়ন,	✓ পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন ও চাষাবাদের জমি তৈরী করা, ✓ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, ✓ খাল ও ছরা সমুহের দু'পাশ দখল হয়ে	✓ বনজ সম্পদের আনুপাতিক মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া, ✓ পাহাড়ি ঢলের সাথে নেমে আসা মাটি ও বালি দ্বারা খাল এবং	✓ খাল ও ছরার সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ নাকরা এবং দখল মুক্ত না করা। ✓ পানি প্রবাহের স্বাভাবিক রাখার জন্য খাল খনন ও ছরা সংস্কার না করা,

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বদরখালী ইউনিয়ন, ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন,পুর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের আংশিক, মানিকপুর সুরাজপুর ইউনিয়ন ও কোনাখালি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। উখিয়া উপজেলার পালংখালি ইউনিয়ন, রাজাপালং ইউনিয়ন, হলদিয়া পালং ইউনিয়ন ও জালিয়াপালং ইউনিয়নের একাংশ পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অন্যদিকে ককসবাজার সদর উপজেলার জোয়ারিয়ানালা, পিএম খালী, ইদগাও, ঝিলংজা ইউনিয়নের কিছু অংশ এবং রামু উপজেলার বাকখালী নদীর দুধারে অবস্থিত জনপদ যেমন-চাকমারকুল,মেরংলোয়া সহ অন্যান্য ইউনিয়নে মারাত্মক বন্যার ফলে কাচাঁ ঘরবাড়ি,জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে পাশাপাশি চিংড়ি ঘের, পুকর, জলাশয়ের মাছ ভেসে বা পানিতে তলিয়ে অর্থনীতির প্রভুত ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে এখানে ১৯৮৭ও ২০০৯ সালের মত বন্যা হলে গ্রামীণ রাস্তা ঘাট পানিতে ডুবে গিয়ে বা পানির স্রোতে ভেঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংকট তৈরী হতে পারে।	যাওয়া, ✓ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে অতিবৃষ্টি। ✓ বন্যা সহায়ক চাষাবাদ না করা। ✓ বন্যার লেভেল অনুযায়ী বাড়ী ঘর তৈরী না করা,	ছরা ভরাট হয়ে যাওয়া, ✓ প্রবাহমান খাল এবং ছরা সমুহের দুই পাড়ে পর্যাপ্ত গাছ না থাকা। ✓ পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা।	
জলাবদ্ধতাঃ মাতামুহুরী, বাকখালী নদী ও রেজুসহ অসংখ্য ছোট বড় খাল ও ছরা পার্শ্ববর্তী জেলা বান্দরবান এর পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে লোকালয় দিয়ে একেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নাফ, কোহেলিয়া নদী এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। জনসংখ্যার আধিক্য,পাহাড়ি ঢলের সাথে নেমে আসা পলিমাটি, দুপাশে দখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, পানি নিঃষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দেয়া,স্লুইচ গেট কার্যকর নাথাকার ফলে বর্ষা মৌসুমে ককসবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার শাহারবিল, বদরখালী, ঢেমুশিয়া, পুর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের আংশিক, মানিকপুর-সুরাজপুর ইউনিয়ন ও কোনাখালি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। উখিয়া উপজেলার পালংখালি ইউনিয়ন, রাজাপালং ইউনিয়ন, হলদিয়া পালং ইউনিয়ন ও জালিয়াপালং ইউনিয়নের একাংশে জলাবদ্ধতার কারণে জনজীবনে দুর্যোগ নিয়ে আসে। তাছাড়া ককসবাজার সদর উপজেলার জোয়ারিয়ানালা, পিএম খালী, ঈদগাও, ঝিলংজা ইউনিয়নের কিছু অংশ এবং রামু উপজেলার বাকখালী নদীর দুধারে অবস্থিত জনপদের নিচু এরাকা,ফসলের জমি,ঘরবাড়ি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। রামু উপজেলার চাকমারকুল, মেরংলোয়া সহ অন্যান্য ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার ঝুকি অনেক বেশী। জলাবদ্ধতার কারণে কাচাঁ ঘরবাড়ি,জমির ফসল,বীজতলা,চিংড়িঘের নষ্ঠ হয়ে যাবে। পাশাপাশি চিংড়ি ঘের, পুকর, জলাশয়ের মাছ ভেসে বা পানিতে তলিয়ে গিয়ে গ্রামীন অর্থনীতির প্রভুত ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে গ্রামীণ রাস্তা ঘাট পানিতে ডুবে গিয়ে বা পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়বে। সংকট তৈরী হতে পারে। স্থায়ী জলাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।	✓ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, ✓ আবাদী জমির অবস্থান নিচু এলাকায় হওয়া। ✓ নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ করা।	✓ অপরিকল্পিত বাধ ও রাস্তা নির্মা, ✓ পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা	✓ খাল ও ছরা দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া,
পরিবেশ বিপর্যয়ঃ বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কাটা এই জেলা তথা দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সামগ্রিকভাবে ঝুকিমুলক কাজ। এটি একটি মানব সৃষ্ট দূর্যোগ। জেলার ৬টি উপজেলাতেই উচু-নীচু	✓ পাহাড় ও গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান	✓ অর্থের লোভে পাহাড়ের গাছ ও মাটি বিক্রি করা,	✓ বনবিভাগের আধুনিক সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত লোকবল না থাকা,

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
ছোটবড় অনেক পাহাড় ও টিলা রয়েছে। এক সময় এসব পাহাড় জুড়ে প্রচুর গাছপালা,বন্যপ্রানী ছিল। কিন্তু বিগত দু'দশকে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন,পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও চাষাবাদের জমি তৈরীর ফলে বনভুমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে বনবূমি ধ্বংশ ও পাহাড় কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়তে পারে।তাছাড়া বন উজাড় হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে জীববৈচিত্র ধ্বংস হতে পারে এবং পরবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে।	না থাকা। ✓ আয়ের উৎস হিসাবে গাছ কেটে বিক্রি করা, ✓ সরকারী জমি বিধায় সহজে দখল করা যায় আবার প্রভাবশালী লোকজনের দখলে থাকা পাহাড় কম দামে কিনতে পাওয়া। ✓ অসাধু চক্রের অসৎ উপার্জনের পথ হিসাবে কাজে লাগানো।	✓ জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে জ্বালানি কাঠের চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়া। ✓ দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের জন্য কাঠের আসবাবপত্র তৈরী ✓ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে পাহাড় ও টিলা কেটে হোটেল মোটেল তৈরীর জন্য নিচু জমি ভরাট। ✓ রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে প্রবেশে করে পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করা ও গাছ কেটে জীবিকা নির্বাহ করা।	✓ সরকারীভাবে অংশিদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের পরিধি বৃদ্ধি না করা, - বনবিভাগের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে কতিপয় প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা। - বন আইন ও পরিবেশ বিষয়ে প্রনীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা না থাকা, - কাঠের বিকল্প জ্বালানীর অধিকমূল্য ও দুস্প্রাপ্যতা।
<u>কালবৈশাখীঃ</u> ককসবাজার জেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় কালবৈশাখীর ঝড়ের কারণে জেলার সব উপজেলার কৃষিখাত বিশেষ করে ধান,পানের বরজ,সবজ্বি চাষ ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আকশ্মিক ঝড়ো হাওয়ার ফলে গাছপালা ভেঙ্গে যেতে পারে।অন্যদিকে গাছ উপড়ে পড়ে,চাল উড়ে গিয়ে মাঠি-শনের তৈরী কাচাঁ ঘরবাড়ি সমুহের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে।	✓ সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা হওয়াতে মৌসুমী বায়ুর অধিক প্রভাব।	✓ জলবায়ু পরিবর্তনে আবহাওয়ার বৈরী আচরণ,	✓ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ঠ করা,
<u>অতি বৃষ্টি/পাহাড় ধ্বসঃ</u> জেলার ৬টি উপজেলায় পাহাড়ি এলাকার সরকারী-বেসরকারী জমিতে প্রচুর লোক বসবাস করে। বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষনের ফলে অনেক জায়গায় পাহাড়ের ঢালু অংশ ধ্বসে পড়ে প্রানহানি ঘটে, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায় এবং গাছপালা ও ফসলের ক্ষতি হয়।	✓ সরকারি ভুমিতে সহজে বসবাসের সুযোগ পায়, ✓ নতুন বসতি স্থাপন	✓ অবৈধ ভাবে টাকা আয় করা, ✓ সরকারী	✓ সরকারি প্রশাসন কতৃক পাহাড়ে নতুন বসতি স্থাপনে কড়া নজরদারি না করা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
	করা, ✓ পাহাড়ের মাটি কেটে স্লুপ নষ্ট করে ফলা ।	সম্পত্তি দখল ।	এবং আইনের প্রয়োগ না থাকা,
খাল ও ছরার পাড় ভাঙ্গনঃ বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের প্রবর স্রোতের কারণে এই জেলার ৭টি উপজেলার অনেক এলাকার খাল ও ছরার দু'পাশের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে যায়,কৃষি জমি বিলিন হয়ে যাবে এবং গাছপালা উপড়ে পড়বে ।	✓ খাল ও ছরা দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া ও ছরা ভরাট হয়ে যাওয়া, । ✓ খালের স্রোতের গতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ।	✓ খাল ও ছরার দুই পাড়ে পর্যাপ্ত গাছ রোপন না করা ,	✓ ভরাট হয়ে যাওয়া খাল ও ছরা খনন না করা, ✓ ভাঙ্গন রোধ করার জন্য স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ব্লক না দেয়া ।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

ঝুকির বিবরণ	ঝুকিঁ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ১৯৯১, ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে ককসবাজার জেলার কুতুবদিয়ার উপজেলার সমগ্র এলাকা , মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা, মাতারবাড়ি, কুতুবজোম, কালারমারছড়া ও হোয়ানক ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ, শাপলাপুর ইউনিয়নের বৃহদাংশ, মহেশখালী পৌরসভার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ এবং ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের কিয়দাংশ; একইভাবে চকরিয়া উপজেলার বদরখালী ইউনিয়ন, পেকুয়া উপজেলার মগনামা, উজানটিয়া ইউনিয়ন; ককসবাজার সদর উপজেলার খুরুস্কুল, চৌফলদন্ডি, পৌরসভার নাজিরারটেক, সমিতিপাড়া, উত্তর ফদনার ডেইল, নুনিয়ারছড়া, কলাতলী, উখিয়া উপজেলার জালিপালং ইউনিয়নের সোনাইছড়ি, সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদ শফিরবিল, রুপপতি, ছোয়াংখালী, ইমামের ডেইল, বাইলাখালী, সেপটখালী ও মনখালী এবং পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, ফাড়িরবিল, থাইংখালী; টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, ... ভেঙ্গে গিয়ে পুরো এলাকা অরক্ষিত হয়ে যেতে পারে ।	▪ সচেতনতা সৃষ্টি করা, ▪ যথাসময়ে পুর্বাভাসের ব্যবস্থা করা, ▪ বীজ সংরক্ষনের কৌশল জানানো, ▪ বন নিধন বন্ধ করা, ▪ বেড়ীবাধ নির্মান করা ।	▪ সংকেত প্রচার করা, ▪ প্যারাবন সৃষ্টি করা, ▪ সর্তক বানীর সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহ প্রচার করা ▪ নিয়মিত রেড়িও শোনার অভ্যাস করা, ▪ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা ।	▪ কমিউনিটি রেডিও চালু করা দুর্যোগের সংকেত স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা, ▪ দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে এবং ঝুঁকি হ্রাসের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসুচীতে অর্ন্তভুক্ত করা, ▪ প্যারাবন সৃষ্টি করা, ▪ পানিoo নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, ▪ উচু করে বেড়ীবাধ নির্মান করা, ▪ বৃক্ষ রোপন করা।
পাহাড়ী ঢল /বন্যাঃ	- পাহাড় ও বন	-খাল ও ছরা সমুহ খনন	- প্রতি বছর খাল খনন ও ছরা সংস্কার

ঝুকির বিবরণ	ঝুকিঁ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ককস্‌বাজার জেলার উখিয়া, রামু, চকরিয়া, ককসবাজার সদর উপজেলার মধ্য দিযে কয়েকটি নদী ও অসংখ্য ছোট বড় খাল প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম মাতামুহুরী, বাকখালী, রেজু। এসমস্ত নদী, ছোট বড় খাল ও ছরা পার্শ্ববর্তী জেলা বান্দরবান এর পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে লোকালয় দিয়ে একেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নাফ, কোহেলিয়া নদী এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।ফলে বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষনের সময় এ সমস্থ খাল,নদী ও ছরার দু'পাশের এলাকা সমুহ আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয়। এধরনের পাহাড়ি ঢল ও বন্যায় চকরিয়া উপজেলার শাহারবিল ইউনিয়ন, বদরখালী ইউনিয়ন, ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন,পুর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের আংশিক, মানিকপুর সুরাজপুর ইউনিয়ন ও কোনাখালি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়	সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা নেয়া, - পানি প্রবাহের জায়গা সংকুচিত না করা,	করা, - বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে উজানে নেমে আসা পানি নদী/সাগরে নেমে যাওযার ব্যবস্থা করা।	করা, - খাল খনন ও ছরার দুই পাশে বনায়ন করা, -বন্যা সহনশীল জাতের ধান চাষ করা।
<u>জলাবদ্ধতাঃ</u> মাতামুহুরী, বাকখালী নদী ও রেজুসহ অসংখ্য ছোট বড় খাল ও ছরা পার্শ্ববর্তী জেলা বান্দরবান এর পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে লোকালয় দিয়ে একেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নাফ, কোহেলিয়া নদী এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। জনসংখ্যার আধিক্য,পাহাড়ি ঢলের সাথে নেমে আসা পলিমাটি, দুপাশে দখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, পানি নিঃষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দেয়া,স্লুইচ গেট কার্যকর নাথাকার ফলে বর্ষা মৌসুমে ককসবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার শাহারবিল, বদরখালী, ঢেমুশিয়া, পুর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের আংশিক, মানিকপুর-সুরাজপুর ইউনিয়ন ও কোনাখালি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। উখিয়া উপজেলার পালংখালি ইউনিয়ন, রাজাপালং ইউনিয়ন, হলদিয়া পালং ইউনিয়ন ও জালিয়াপালং ইউনিয়নের একাংশে জলাবদ্ধতার কারণে জনজীবনে দুর্যোগ নিয়ে আসে।	-নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মান না করা, - পাইপ দিয়ে পানি সরানোর ব্যবস্থা করা।	- পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লুইচ গেট স্থাপন করা, - খাল পুন: খনন করা। -গ্রাম্য রাস্তা তৈরী সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখা।	- পরিকল্পিতভাবে রাস্তা ঘাট তৈরি করা। - বেড়ী বাঁধের সাথে স্লুইচ গেট দেয়া।
<u>পরিবেশ বিপর্যয়ঃ</u> বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কাটা এই জেলা তথা দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সামগ্রিকভাবে ঝুকিমুলক কাজ। এটি একটি মানব সৃষ্ট দূর্যোগ। জেলার ৬টি উপজেলাতেই উচু-নীচু ছোটবড় অনেক পাহাড় ও টিলা রয়েছে। এক সময় এসব পাহাড় জুড়ে প্রচুর গাছপালা,বন্যপ্রানী ছিল। কিন্তু বিগত দু'দশকে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন,পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও চাষাবাদের জমি তৈরীর ফলে বনভুমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে বনবৃমি ধ্বংশ ও পাহাড় কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়তে পারে।তাছাড়া বন উজাড় হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে জীববৈচিত্র ধ্বংস হতে পারে এবং পরবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে।	- জীবন,পরিবেশের সাথে গাছপালা ও পাহাড়ের সম্পর্ক, প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনগনকে সচেতন করা, - বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা, -	- কাঠের জ্বালানীর বিকল্প জ্বালানীর সরবরাহ এবং দাম সাশ্রয়ী করা করা,	-ব্যাপক হারে সামাজিক বনায়ন সৃজনের উপর গুরুত্ব দেয়া, - বনবিভাগকে শক্তিশালী করা, - অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিধান করা, - সরকারের পক্ষ থেকে বৃক্ষ নিধন,পাহাড় কাটা সহ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সঠিক প্রয়োগ করা।

ঝুকির বিবরণ	ঝুকিঁ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
কালবৈশাখীঃ ককসবাজার জেলা সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় কালবৈশাখীর ঝড়ের কারণে জেলার সব উপজেলার কৃষিখাত বিশেষ করে ধান,পানের বরজ,সবজ্বি চাষ ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আকশ্মিক ঝড়ো হাওয়ার ফলে গাছপালা ভেঙ্গে যেতে পারে।অন্যদিকে গাছ উপড়ে পড়ে,চাল উড়ে গিয়ে মাঠি-শনের তৈরী কাচাঁ ঘরবাড়ি সমুহের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে।	বাড়ির পাশে শক্ত কাটের গাছ রোপন বৃদ্ধি করা, ইটের ভাটায় লাকড়ি পোড়া বন্ধ করা, বসত ঘর শক্ত করে তৈরী করা।	প্যারাবন সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, পাহাড় কাটা রোধ করা, বন নিধন বন্ধ করা।	আইনের প্রয়োগ করা, জাতীয় ভাবে পরিকল্পনা ও প্রণয়ন বাসত্মবায়ন করা, পাহাড় সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা ও সংরক্ষন করা।
অতি বৃষ্টি ও পাহাড় ধ্বসঃ জেলার ৬টি উপজেলায় পাহাড়ি এলাকার সরকারী-বেসরকারী জমিতে প্রচুর লোক বসবাস করে।বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষনের ফলে অনেক জায়গায় পাহাড়ের ঢালু অংশ ধ্বসে পড়ে প্রানহানি ঘটে, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায় এবং গাছপালা ও ফসলের ক্ষতি হয়।	সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশাসনকে জানানো।	আইনের প্রয়োগ করা, প্রশাসনের সহায়তা।অংশীদারের ভিত্তিতে পাহাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা।	পাহাড় কাটা আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
খাল ও ছরার পাড় ভাঙ্গনঃ বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের প্রবর স্রোতের কারণে এই জেলার ৭টি উপজেলার অনেক এলাকার খাল ও ছরার দু'পাশের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে যায়,কৃষি জমি বিলিন হয়ে যাবে এবং গাছপালা উপড়ে পড়বে।	খাল বা ছরা পুনঃখনন করা, ছড়ার দুপাশে বৃক্ষ রোপন করা, পাহাড়ে বৃক্ষ রোপন করা।	পাহাড় ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষন করা, পাহাড় কাটা রোধ করা।	ছড়ার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্র/নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.	বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৮টি উপজেলায়	সেপ্টেম্বর - ২০১৪
২.	শেড(SHED)	ইনানী রক্ষিত বনাঞ্চল সহ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সৌহাদ্য -দুযোগ ঝুঁকি, প্রশমন ও জলবায়ু পরির্বতন	১৫৬০জন ৭৯৯৩ জন	২০০৯ -২০১৪ ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত
৩	রিসোর্স ইনন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা , জলবায়ু পরির্বতন	২টি উপজেলায়	সেপ্টেম্বর-২০১৪
৪	কেয়ার বাংলাদেশ	সোহার্দ্য - দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন ও জলবায়ু পরিবর্তন	২টি উপজেলায়	২০১৩-১৫
৫	ব্র্যাক	ওয়াশ কর্মসূচী , দূর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মসুচী	২,০৬০ জন	চলমান

ক্র/নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
৬	ওয়াল্ড ভিশন	শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৫০০০ জন	২০১৭
৭	সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স ষ্টাডিজ (সিএন আরএস)	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	১০০০ জন	চলমান
৮	প্রত্যাশী	পরিবেশ ও পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মসুচী	৮,০০০জন	২০১২-২০১৪
৯	নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (সিএনআরএস)	উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	২,০০০জন	চলমান
১০	এক্সপেউরুল	জলবায়ু পরির্বতন	২টি ওয়ার্ড	চলমান

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
১.	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	৫৫০টি দল	১৬,৫০,০০০	৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪টি পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১৫%	৩০%	২০%	কার্যক্রমগুলো উপজেলার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫৫০টি	২,৫০,০০০	৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪টি-পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৩	বন্যার আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৫৫০টি	১,৫০,০০০	৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪টি পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষে পরিকল্পনা	৫৫০টি	১১,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৫	স্থানীয় বিপদ সীমা নির্ধারণ ও দুর্যোগ পূর্ব সর্তক বার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার	৫৫০টি	১১,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৬	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি	৫৪০টি	৫,৪০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৭	মহড়ার আয়াজন	৭০টি	৭,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষন	৬০টি	৩,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান বিশেষ রাখবে।
৯	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	শুকনো-৪০টন চাল/ডাল-৫০টন	৪০,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতিটি স্কুলে ৮০০টি	১৬,০০,০০০	স্কুলে	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১১.	আশ্রয়ন কেন্দ্রের মেরামত	৫০০টি	২,৫০,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১২.	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৬০টি	৬০,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.২ দুর্যোগকালীন ঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
১	ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ	৫৬ টি	১,৬৮,০০০	উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	কার্যক্রমগুলো উপজেলার সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। তাই কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবাবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	নারী, শিক্ষা, বৃদ্ধা, অসুস্থ,ও প্রতিবন্ধীদের জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা	৫৫০ টি	৫,৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	উদ্ধার ও আশ্রয় ও হাসপাতালে নেয়া	১৫০,০০০ পরিবার	১৫,০০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচারের জন্য সার্বিক	৫৫০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
	প্রস্তুতি গ্রহণ									
৫	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা	১৫০,০০০ পরিবার	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬	শুকনো খাবার বিতরণ	৫৫০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৪৮ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮	বিপদ সীমার অতিক্রম করলে পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্তা প্রচার	৫৫০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯	আইন শৃঙাখলা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা	৬০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১০	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৫৫০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৩. দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
১	দ্রুত উদ্ধার কাযক্রর্ম শুরু করা	৫৫০টি	১৬,৫০,০০০	উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	কার্যক্রমগুলো উপজেলার সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে
২	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করা	৫৫০টি	১১,০০,০০০	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৩	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারনের ব্যবস্থা গ্রহন করা	৫০,০০০	১১,০০,০০০	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৭৫টি	-	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
৫	যোগাযোগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা	৫৫০টি	২৭,৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	মানুষের সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবাবায়িত হলে সর্ব ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।
৬	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৫৫০টি	২৭,৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৭	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৭৫টি	-	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৮	জরুরী জীবিকা সহায়তা করা	৭৬টি	-	ঐ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৪. স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকি হ্রাস সমন্বয়ঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউ নিনিট	ইউপি	এনজি/ও	
১	বেড়ীবাধ মেরামত ও নির্মাণ	৭০ কি.মি.	প্রতি কিমি. ২৫ লক্ষ	কুতুবদিয়া-১২কিমি: উত্তর ধুরুং : অলিপাড়া হতে চরপাড়া হয়ে সতউদ্দীন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত দক্ষিণ ধুরং: মিজ্জিরপাড়া হতে বিন্দা পাড়া পর্যন্ত লেমশীখালী : দরবার ঘাট হতে পিলটকাটা পর্যন্ত কৈয়ারবিল: পশ্চিমে গিলাছরি হতে বিন্ধাপাড়া পর্যন্ত পুর্বে উত্তর মালুচর হতে দক্ষি মালুমচর পর্যন্ত বড়ঘোপ : পশ্চিমে বড়ঘোপ বাজার হতে লোসাইপাড়া পর্যন্ত -পুর্বে মিয়ারঘোনা হতে দক্ষি মোরালিয়া পর্যন্ত আলী আকবর ডেইল : গাইট পাড়া হতে তাবলের চর হয়ে জেলে পাড়া পর্যন্ত পেকুয়া-৮কিমি., চকরিয়া-১০কিমি., মহেশখালী ২০কিমি., ককসবাজারসদও ১০কিমি., টেকনাফ ৫কিমি., উখিয়া ৫কিমি.	অক্টোবর-এপ্রিল	৪০%	৫%	১০%	৪৫%	উপজেলা সকল বিভাগ /বোর্ড, স্থানীয়

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউ নিনিট	ইউপি	এনজি/ও	
২	স্লুইচগেইট	৫৫টি	প্রতি ৫০ লক্ষ টাকা	**কুতুবদিয়ায়- ১০টি** -ফরিজ্যানী পাড়া উত্তর ধূরং ১নং ওয়ার্ড - আকবরবলী পাড়া উত্তর ধূরং ৪নং ওয়ার্ড - গাইনারজুরা স্লুইচ গেইট লেমশীখালী ৪ নং ওয়ার্ড - পুটখালী জুরা স্লুইচ গেইট লেমশীখালী ৯ নং ওয়ার্ড - ক্রসডেম স্লুইচগেইট মলমচার কৈয়ারবিল ৯ ওয়ার্ড় - বিটিশ স্লুইচগেইট মলমচর কৈয়ারবিল ৯ ওয়ার্ড় - আজম কলোনী স্লুইচ গেইট বড়ঘোপ, ৭নং ওয়াড - মোরালিয়া স্লুইচ গেইট বড়ঘোপ , ৬ নং ওয়ার্ড - কুমিরাচর স্লইচ গেইট আলী আকবর ডেইল ৬ নং ওয়ার্ড -তাবালেচর কাটাখালী স্লুইচ গেইট আলী আকবর ডেইল ৮নং ওয়ার্ড পেকুয়া-৫টি, চকরিয়া-১০টি. মহেশখালী ১০টি. ককসবাজারসদর ৫টি. টেকনাফ ৩টি. উখিয়া ২টি	অক্টোবর-এপ্রিল	৪০%	৫%	১০%	৪৫%	প্রশাসন এর সাথে সমন্বয় করে সঠিকভাবে বাস্তবাবায়িত হলে সর্ব ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।
৩	রাস্তা নির্মান ও মেরামত	৫৪০ কিমি.	প্রতি কিলোমিটার ইট সলিং রাস্তা ১০ লক্ষ টাকা	কুতুবদিয়া, পেকুয়া, চকরিয়া, মহেশখালী, ককসবাজারসদর, টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার জেলার ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে	অক্টোবর-এপ্রিল	৫০%	-	-	৫০%	
৪	মাটির কেল্লা মেরামত	৪টি	প্রতিটি ২০লক্ষ টাকা	কুতুবদিয়া উপজেলার মুজিব কেল্লা দক্ষিন ধরুং ১ ওয়ার্ড, লেমশিখালী ৬ ওয়ার্ড ধুপীপাড়া	অক্টোবর-এপ্রিল	২০%	-	-	৮০%	
৫	খাল খনন	৫০টি	প্রতিকিমি. ১৫লক্ষ টাকা	**কুতুবদিয়া-২০টি** উত্তর ধুরুং : জোয়ারাখাল, ধুরংখাল, খুইল্যাপাড়াখাল, বাইঙ্গকাটাখাল, তেলিয়াকাটাখাল, সতরউদ্দীন খাল দক্ষিণ ধুরং : রাজাখালী খাল, লেমশীখালী : মিরাখালীখাল, গাইনাকাটখাল কৈয়ারবিল : ডিঙ্গাভাঙ্গাখাল বড়ঘোপ : মুরালিয়াখাল, আমজাখালীখাল	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউ নিনিট	ইউপি	এনজি/ও	
				আলী আকবর ডেইল :কুমিরাচরা খাল, রাজাখালী খাল **পেকুয়া-৫টি** **চকরিয়া-৭টি** **মহেশখালী ৫টি** **রামু-৩টি** **ককসবাজারসদর ৪টি** **টেকনাফ ৩টি** **উখিয়া ৩টি**					
৬	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	১০৫	প্রতি ১কোটি ২০লক্ষ টাকা	**কুতুবদিয়া -২০টি** **উত্তর ধুরুং : ৫টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টি ও উত্তরন উচ্চ বিদ্যালয় ৭নং ওয়ার্ডে ১টি **দক্ষিণ ধুরং : ৪টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি **কৈয়ারবিল : ৪টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি **বড়ঘোপ : ২টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি **আলী আকবর ডেইল : ৫টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি **পেকুয়া-১৫টি** **চকরিয়া-২০টি** **মহেশখালী ২০টি** **ককসবাজারসদর ১০টি** **টেকনাফ ১০টি** **উখিয়া ১০টি**	অক্টোবর-এপ্রিল	৫০%	-	-	৫০%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউ নিনিট	ইউপি	এনজি্ও	
৭	কালবার্ট	৭৫০টি	প্রতিটি ৩ লক্ষ টাকা	প্রতি ইউনিয়নে ১০টি করে	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	
৮	সেনিটেশন	৭৫,০০০	প্রতিটি ৩ লক্ষ টাকা	প্রতি ইউনিয়নে ১০০০ করে	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	
৯.	গভীর নলকুপ	৩৭৫০টি	প্রতি টাকা ৭৫০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৫০টি করে	অক্টোবর-এপ্রিল	২০%	১০%	১০%	৬০%	
১০.	বৃক্ষ রোপন	৫০০কমি.	প্রতি কিমি. ১,৫০,০০০ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের চরাঞ্চল	মে-জুলাই	৬০%	৫%	১০%	২৫%	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া

৪.১ কক্সবাজার জেলা জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
২	শ্যামল কুমার নাথ	পুলিশ সুপার	০৩৪১-৬৩২৭০, ০১৭১৩-৩৭৩৬৫৭
৩	মোঃ নুরুল আবছার	উপ-পরিচালক, কৃষি সমপ্রসারন অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৩২৮৭, ০১৮১৯-৪৮৮৯৮৭
৪	মো: শাহ আলমগীর	নির্বাহী প্রকৌশলী - এলজিইডি	০৩৪১-৬৪২১৮, ০১৮১৯-২৩০২৭৮
৫	এড. সিরাজুল মোস্তফা	সভাপতি-রেড় ক্রিসেন্ট স্যোসাইটি	০৩৪১-৬৪৩০৭, ০১৭১২-৫১৩৬১০
৬	সরওয়ার কামাল	মেয়র, ককসবাজার পৌরসভা	০৩৪১-৬৪০৬১, ০১৮৫০-৬৪৮০০৩
৭	মো: সোহরাব হোসেন	নির্বাহী প্রকৌশলী-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	০৩৪১-৬৩৬৩১, ০১৭২৭-৩৯৫২৮০
৮	মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা ঃ

- দুর্যোগ হওয়ার সাথে সাথেই জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ, আনচার ও চৌকিদার উপস্থিতি করতে হবে।
- উপজেলা সদরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
- কন্ট্রোলরুমে একটি রেজিস্টার খাতা থাকবে, সেখানে কোন সময় কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন এলাকা, কোন রাস্তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে রেডিও, টর্চ লাইট, চার্জার লাইট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট প্রভৃতি চাহিদা অনুযায়ী মজুদ থাকবে।

৪.২ ককসবাজার জেলার আপদকালীন পরিকল্পনা ঃ

ক্র নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
২.	সতর্ক বার্তা প্রচার	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৩.	নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৪.	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা /মৃত ব্যবস্থাপনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ।
৬.	শুকনা খাবার,	১	মার্চ	ইউনিয়ন	জিও,এনজিও,	ট্রেনিং,	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,

ক্র নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা		মাসে	পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ	কমিউনিটি	ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	উপজেলা ও জেরঅ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৭.	গবাদী পশু চিকিৎসা, টিকা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন , উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং উপজেলা ও জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সাথে যোগাযোগ ।
৮.	মৃত ব্যবস্থাপনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৯.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১০.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১১.	মহরা আয়জন করা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশ, মিটিং	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্শনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

ওয়ার্ড় পযায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।

- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতরর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুরোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্র ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পযর্ন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্বওয়ার্র ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।

- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে। এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদদেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁতিপূর্ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুরোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহুর্ কোন কোন নির্ষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুরোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্ক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬নৌকাপ্রস্তুতরাখা

- জেলা/উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুরোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষীত থাকবে।

৪.২.৭ দুরোগের ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদনপ্রেরণ :

- দুরোগ অব্যহতির পর পরবর্ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ড” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন েএকত্রিত করে পরবর্ী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূণর্াসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী, পূণর্াসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ পর্ায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্র জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার ওযমন, চিড়া, মড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্ানের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।

- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদি পশু রচিকিৎসা / টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঐষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানী চিতিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবাতা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিকত্রান কার্ পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুরোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছরএপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্বতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্ালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুরোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্ালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম সথাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্ কন্ট্রোল রুমের সার্ক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে বিদা-রাত্রি কন্ট্রোলরুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ম্বনিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্না লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ কক্সবাজার জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা বর্ণনা উপজেলা ভিত্তিক পর্যায়ক্রমে প্রদান করা হলোঃ

ককসবাজার জেলায় ৮টি উপজেলার মোট ৭৩২টি আশ্রয় কেন্দ্র আছে। **টেকনাফ উপজেলায় ৭০টি** (স্কুল কাম শেল্টার ৪৯টি+ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৬টি+ সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১৫টি), **উখিয়া উপজেলায় ৪১টি** (স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার ৩১টি+ সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাম সাইক্লোন সেল্টার ১০টি), **ককসবাজার সদর উপজেলায় ১৬১টি** (ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৭টি+স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার ৯৪টি+ সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ৫৭টি+ইউপি ভবন ৩টি), **কুতুবদিয়া উপজেলায় ১১১টি** (মাটির কেল্লা ৩টি+ মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার ১২টি+ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৩৩টি+স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার ৫২টি+ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫টি+ইউপি ভবন ৬টি। **চকরিয়া উপজেলায় ১১৬ টি** (স্কুল কাম শেল্টার ৭২টি+ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র /সরকারী/বেসরকারী ৪৪টি), **পেকুয়া উপজেলায় ৮৫ টি** (স্কুল কাম শেল্টার ৪২টি+ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র /সরকারী/বেসরকারী ৪৩টি) মহেশখালী উপজেলা ৮২টি (স্কুল কাম শেল্টার ৩৯টি+ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৪৩টি), রামু উপজেলা ৬৬টি (স্কুল কাম শেল্টার ৬১টি + ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৫টি)। জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের পূর্ণঙ্গ তালিকা সংযুক্ত করা হলো। **জেলার নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা - সংযুক্তি-৮**

৪.৪. আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাচাঁনো।
- দুর্যোগের সময় গবাদি পশুর জীবন বাঁচানো।
- আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্রব্যবস্থাপনাকমিটি :

- আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-৭-৯জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ,জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্ ধারনা দেয়া (আশ্রয় কেন্দ্র বিষয়ে)।
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্ষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্রিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয়স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচুরাস্তা

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছুজরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিলইত্যাদি)/পিানিশোধনবড়ি/ব্লিচিংপাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা।
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)।
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবজর্না সরানোর ব্যবস্থা করা।
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- আলোর ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ওষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া।
- আশ্রয় কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নিদির্ষ্টভাবে স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব গ্রহণ করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভতবী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবহার :

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত: দুরোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এরজন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্ক্রমেআশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র সুষ্টূভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে স্থানীয়ভাবে উদ্দোগ নিতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষরোপন করতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

ককসবাজার জেলায় বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা, উখিয়া, টেকনাফ, চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া ও রামু উপজেলার বিভিন্ন ধরণের আশ্রয় কেন্দ্রের যেমন মাটির কেল্লা, স্কুল কাম শ্লেটার সেন্টার, সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেগুলো দুর্যোগের সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হতো যেসব কেন্দ্রের কমিটির তালিকা সংযুক্ত করা হলো। **(কমিটি সমুহের তালিকা সংযুক্ত করা হলো,সংযুক্তি-৪)** ।

৪.৫. কক্সবাজার জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)ঃ

জেলার দুর্যোগকালীন সময়ে সম্পদ যেমন মাটির কেল্লা, মাটির কেল্লার কাম সাইক্লোন সেন্টার, স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনাগুলো সম্পদ হিসাবে বিবেচিত সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

অবকাঠামো/সম্পদ	সংখ্যা	দায়িপ্তপ্রাপত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	৫১৪টি (৮টি উপজেলায়)	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, চেয়ারম্যান ও সেল্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	৫১৪টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টারে প্রায় ৪,৯০,৫০০জন আশ্রয় নিতে পারে। কেন্দ্র গুলো সাইক্লোন সেল্টার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রায় বিদ্যায়ের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	২৩৪টি	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	২৩৪টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ১,৮৬,০০০জন আশ্রয় নিতে পারে। সেল্টার গুলো সাইক্লোন সেল্টার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রায় বিদ্যায়ের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন।
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	২২টি	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	দুর্যোগ হলে ২২টি ইউপি ভবনে প্রায় ১৭,৫০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে।
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	২০টি	দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, চেয়ারম্যান ও সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	দুর্যোগ হলে প্রায় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেন্দ্র গুলোতে ১০,০০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে।
মেগাফোন	২০০টি	সিপিপি টিম লিডার ও ইউপি	দীর্ঘ সময় ধরে বড় ধরনের কোন দুর্যোগ না হওয়ায় দুযোর্গ কাজে ব্যবহৃত সমস্ত সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদের তত্বাবধানে সিপিপি ইউনিয়ন টিম লিডারের কাছে রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট, রেডিওসহ প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে।
সাইরেন	১০০টি	ঐ	
রেডিও	২০০টি	ঐ	
বাইসাইকেল	-	ঐ	
রেইন কোর্ট	৩০০টি	ঐ	
হেলমেট	৩০০টি	ঐ	
গামবুট	৩০০টি	ঐ	
স্ট্রেচার	১০টি	ঐ	
লাইফ জ্যাকট	৫০০টি	ঐ	
টর্চ লাইট	১০০টি	ঐ	
ট্রাক / বাস/নৌকা	৮০টি	মালিক	

৪.৬. অর্থায়ন ঃ

পরিষদের আয়

(ক) নিজস্ব উৎস

- বসত বাড়ী মূল্যের উপর ট্যাক্স ঃ
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স) ঃ
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ঃ
- ইজারা বাবদ (হাটবাজার, ঘাট, খাল, খেয়াঘাট) ঃ
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর ঃ
- সম্পত্তি হতে আয় ঃ
- বিনোদন কর ঃ
- ইউপি সাধারণ তহবিল - জন্ম সনদ ঃ
  মৃত্যু সনদ ঃ
  ওয়ারিশ সনদ ঃ
  জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় সনদ ঃ

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- সংস্থাপন ঃ
- উন্নয়ন (এলজিএসপি) ঃ
- স্থানীয় সরকার (উপজেলা) ঃ
- অন্যান্য ঃ
- **সংস্থাপনঃ**
  চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতাঃ
  চেয়ারম্যান (৫জন) প্রতিঃ সরকারীঃ ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে ঃ
  এম ইউ পি (৬০জন) প্রতিঃ সরকারীঃ ৯৫০/-,পরিষদ থেকে ঃ
  সচিব (স্কেল) ৫ জন প্রতি ঃ
  দফাদার (৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন ঃ
  গ্রাম পুলিশ(৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন ঃ

- ভূমি হস্তান্তর ১% ঃ
- অন্যান্য

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

(ঘ) বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা

৪.৭ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও পরীক্ষাকরণঃ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
২	মোখলেছুর রহমান খাঁন	সিভিল সার্জন	০৩৪১-৬৩৭৬৮
৩	আবু জাফর মো: সালেহ	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৫৬, ০১৮২৭-৫৪১৫১৯
৪	প্রিতম কুমার চৌধুরী	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৪৬৯০, ০১৮২০৩০১৯৪৭
৫	ফেরদৌস আহমদ	জেলা মৎস কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৬৮, ০১৭১৮-৩১২৫৫৯
৬	এড. নজরুল ইসলাম	প্রকল্প সমন্বয়কারী - বিজিএস	০১৮১৮-০০৬৯৫৬
৭	মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ও রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটি

ক্র/নং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
২	মোঃ নুরুল আবছার	উপ-পরিচালক, কৃষি সমপ্রসারন অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৩২৮৭, ০১৮১৯-৪৮৮৯৮৭
৩	মো: শাহ আলমগীর	নির্বাহী প্রকৌশলী - এলজিইডি	০৩৪১-৬৪২১৮, ০১৮১৯-২৩০২৭৮
৪	মুঃ মোস্তাফিজুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী - পিডিবি	০১৭৫৫-৫৮৩০১৭
৫	এ.কে.এম. সফিকুল হক	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৩৪১-৬৩৫৫৭, ০১৭৩২-৫৬৬৯৯০
৬	আবু জাফর মো: সালেহ	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৫৬, ০১৮২৭-৫৪১৫১৯
৭	মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা, আগাগোড়া, পরীক্ষা প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটি সদস্য সচিব এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেবেন। প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন

৫.১. ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

ভৌগলিক অবস্থান কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্র জেলার ভিবিন্ন উন্নয়ন খাতগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রহস্ত হয়ে থাকে। জেলার প্রাকৃতিক দূর্যোগের ইতিহাস এবং অন্যান্য আপদসমুহ বিশ্লেষণ করে কক্সবাজার জেলার ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলোঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কৃষির উপর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফসলী জমি, ধানের বীজতলা, নষ্ট হওয়া, লবনাক্ততার মাত্রা বৃদ্বিরমত মারাত্নক ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকে। অনুমান করা যায় ২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে অত্র জেলার কৃষিজ জমির প্রায় ৭০% ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে যার আনমানিক ক্ষতির পরিমান ২০ কোটি টাকা। বিগত ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৬০% ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত। অন্যদিকে ২০১০ সালের বন্যা মত বন্যা হলে প্রায় ৫০% জমির ফসল বিনষ্ট হতে পারে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে কৃষি জমির প্রায় ৪০% ফসল বিনষ্ট হতে পাবে। পোকার আক্রমণে জমির প্রায় ২০% ধান নষ্ট হতে পারে এবং ৫০০ একর পানের বরজ পোকার আক্রমনে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া বন্যহাতির আক্রমণে ধানী জমির প্রায় ১৫% ফসল নষ্ট হতে পারে। কালবৈশাখী কারণে প্রায় ৩০% পান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে প্রায় ৭০% পানের বরজ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে পারে। ভারী বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে আকস্মিক বন্যার কারণে প্রায় ৪০% পান চাষের ক্ষতি হতে পারে।
মৎস / চিংড়ী	কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম চিংড়ি হ্যাচারী উৎপাদন এলাকা। প্রতি বছর ৫০০ কোটি টাকা চিংড়ি পোনা উৎপাদিত হয় এই জেলাতেই। চিংড়ি পোনা উৎপাদন মৌসুমে যদি ১৯৯১, ১৯৯৪ অথবা ১৯৯৭ সালের ন্যায় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামী আঘাত হানে, তাহলে হ্যাচারী/মৎসা ও চিংড়ি খাতে প্রায় ৪০০কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েয়ে। অন্যদিকে ২০১০ সালের মতো বন্যা হলে এবং যদি চিংড়িঘের ও হ্যাচারী বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় তাহলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী চিংড়ি উৎপাদন মারাত্নক ক্ষতির মুখে পড়বে এবং প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল বা বন্যার কারণে পুকুর, খাল-বিল, জলাশয়ে মাছ চাষ পানিতে তলিয়ে গিয়ে মৎস চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খালের পার ভাঙ্গন, বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কাটা, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কারণে মাছের প্রজনন ও আবাসস্থল মারাত্নকভাবে ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে।
অবকাঠামো	ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারের পানি বৃদ্ধি, সুনামী, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী, ভূমি ধসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে অবকাঠামোগত ক্ষতির ঝুঁকি খুব বেশী। কিছু পাহাড়ী আঞ্চল বিধায় ঘূর্ণিঝড়, পাহাড় নিধন, পাহাড়ী বন্যা, সুনামী'র মত দূর্যোগে প্রতিরক্ষা বেড়ীবাধ, মেরিন ড্রাইভ সড়ক বিলীন হয়ে যেতে পারে ভূখন্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রাস্তা ঘাট, গ্রামীন সড়ক, ব্রীজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজারসহ অন্যান্য সামাজিক সম্পদ ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে প্রায় ৫০% মাটির ও ৩০% টিনের বাড়ির ক্ষতি হতে পারে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে নীচু এলাকার প্রায় ৩০% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামগুলোতে পাহাড় ধ্বস হলে প্রায় ২৫% ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কালবৈশাখী হলে জেলার ৩৫% মাটির বাড়ি ও ১৫০% টিনের বাড়ী ক্ষতি হতে পারে।
গাছপালা ও পরিবেশ	ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারের পানি বৃদ্ধি, সুনামী, ভূমিকম্প, কালবৈশাখীর মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে দ্বীপের সুরক্ষার জন্য সৃষ্ট সবুজ বেষ্টনী বা প্যারাবন মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। তাছাড়া ভূখন্ডের অভ্যন্তরে বসতভিটায় ও অন্যান্য রাস্তাঘাটে রোপনকৃত গাছপালা উপড়ে-ভেঙে পড়তে পারে। এতে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে।
আবাসন	এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটি বা বেড়া দিয়ে তৈরী। তাই সমুদ্র বেষ্ঠিত এই লোকালয়ে ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ও ভূমিকম্পের ফলে সাধারণ মানুষের আবাসন মারাত্নক হুমকির মধ্যে পড়ে।
পানি	ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক গঠনের কারণে জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় বিশুদ্ধ পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারের পানি বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে গভীর ও অগভীর নলকুপ সমুহ নষ্ট বা পানিতে ডুবে যাবে। তাছাড়া মিঠা পানি যেমন: পুকুর, জলাশয় লবনাক্ত পানিতে ডুবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। সুনামী ও ভূমিকম্পের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে পরিবর্তন বা লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে পানীয় জলের সংকট তৈরী হতে পারে।
জীবিকা	প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মৎস্য/চিংড়ী চাষ, লবন শিল্প, কৃষি সর্বোপরি অবকাঠামো নষ্ট হওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের আয়ের উৎস কমে যেতে পারে। তাছাড়া শ্রমজীবি মানুষের কর্মসংস্থানের পরিধি সংকুচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যার কারণে জীবিকার সংকট নেমে আসতে পারে। মৎসজীবিদের উপকরণ নষ্ট হয়ে শতশত মৎসজীবিদের জীবিকা সংকটে পড়বে।

খাতসমূহ	বর্ননা
যোগাযোগ	এলাকার ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এলাকা যোগযোগ বিশেষভাবে কাঁচা রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষে চলাফেরা মারাত্বক ঝুকির মধ্যে পড়ে যায় । এছাড়া দুর্যোগের কারণে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা সাধারণ লোকজনদের চলাচলে মারাত্বক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে ।

৫.২ দ্রুত ও আগাম পুনরুদ্ধার ঃ

নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
মোহাম্মদ সানা উল্লাহ	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৪২০৫, ০১৫৫৪৩৪৩২০৭
নূরুন্নবী	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৮১৫-৪৪৯০৩৮,০৩৪১৬৩৩০৫
মো: ইব্রাহিম ভুইয়া	জেলা আনচার ভিডিপি এ্যাডজুটেন্ট	০৩৪১-৬৩৭৩৩, ০১৭৩০০৩৮০৭৫
ওহিদুর রহমান	জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৬৬, ০১৯১১-৫৮৩৪৭৫
এ.কে.এম. সফিকুল হক	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৩৪১-৬৩৫৫৭, ০১৭৩২-৫৬৬৯৯০
তসলিম উদ্দিন জোমাদ্দার	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপুর্ত	০৩৪১-৬৩৫৪৭, ০১৮১৯-২৪৫১৩৯
কে.এম. নুর-ই আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী, আর ও এইচ	০৩৪১-৬৩৩২৫, ০১৭৩০-৭৮২৬৮৬
মো: কামাল উদ্দীন ভুইয়া	উপ-সহকারী পরিচালক-এফএসসিডি	০৩৪১-৬৩৬০৪, ০১৭৩০-০০২৪৩৬

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃ প্রতিষ্ঠাঃ

নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
শ্যামল কুমার নাথ	পুলিশ সুপার	০৩৪১-৬৩২৭০, ০১৭১৩-৩৭৩৬৫৭
মো: শাহ আলমগীর	নির্বাহী প্রকৌশলী - এলজিইডি	০৩৪১-৬৪২১, ০১৮১৯-২৩০২৭৮
এ.কে.এম. সফিকুল হক	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৩৪১-৬৩৫৫৭, ০১৭৩২-৫৬৬৯৯০
মো: ইব্রাহিম ভুইয়া	জেলা আনচার ভিডিপি এ্যাডজুটেন্ট	০৩৪১-৬৩৭৩৩, ০১৭৩০০৩৮০৭৫
মু: মোস্তাফিজুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী - পিডিবি	০১৭৫৫-৫৮৩০১৭
মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ঃ

নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
আবদুল মান্নান	জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩৬২৭, ০১৭১৬-৬৫২৬৫৪
এড. সিরাজুল মোস্তফা	সভাপতি - রেড় ক্রিসেন্ট স্যোসাইটি	০৩৪১-৬৪৩০৭, ০১৭১২-৫১৩৬১০
মো: কামাল উদ্দীন ভুইয়া	উপ-সহকারী পরিচালক-এফএসসিডি	০৩৪১-৬৩৬০৪, ০১৭৩০-০০২৪৩৬
মু: মোস্তাফিজুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী - পিডিবি	০১৭৫৫-৫৮৩০১৭
কে.এম. নুর-ই আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী, আর ও এইচ	০৩৪১-৬৩৩২৫, ০১৭৩০-৭৮২৬৮৬
মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরুরাম্ভ ঃ

নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
ডা: মোখলেছুর রহমান খাঁন	সিভিল সার্জন	০৩৪১-৬৩৭৬৮
মো: সোহরাব হোসেন	নির্বাহী প্রকৌশলী-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	০৩৪১-৬৩৬৩১, ০১৭২৭-৩৯৫২৮০
নূরুন্নবী	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৮১৫-৪৪৯০৩৮
মোহাম্মদ সানা উল্লাহ	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৪২০৫, ০১৫৫৪৩৪৩২০৭
সুব্রত বিশ্বাস	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২১৮, ০১৭১৮-৪২৬৮৯২
মো: মোবারক হোসেন	জেলা ত্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৬৪২৫৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ঃ

নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
জনাব মোঃ রুহুল আমিন	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৯৩৯, ০১৭১৩-১৬০০৯৩
জনাব মোঃ নুরুল আবছার	উপ-পরিচালক, কৃষি সমপ্রসারন অধিদপ্তর	০৩৪১-৬৩২৮৭, ০১৮১৯-৪৮৮৯৮৭
জনাব মিনওয়া ভন	প্রতিনিধি - ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম	০১৭৫৫-৬৪২১৬৩
জনাব মো:আতিবকুল ইসলাম	কেয়ার প্রোগ্রাম ম্যানেজার	০১৭১১-৫৭৪৩৫১
এড. সিরাজুল মোস্তফা	সভাপতি - রেড় ক্রিসেন্ট স্যোসাইটি	০৩৪১-৬৪৩০৭, ০১৭১২-৫১৩৬১০
জনাব মো: শামশুজ্জামান খাঁন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০৩৪১-৬৩৩১১, ০১৭৩১-২৬৪২৪৬
জনাব মো: আবদুল মজিদ	জেলা ক্রান এবং পুনবাসন কর্মকর্তা	০১৭১২-০৭২২৭৯